আয়াকো

– রহমান মণি

১৯৯১ সালে বিয়ে করি এক জাপানিজ তরুণীকে। এক সঙ্গে কাজ করার সুবাদে তার সঙ্গে পরিচয় হয় বিয়ের দেড় বছর আগে। অবশ্য তখন প্রেম ভালোবাসা নিয়ে কোনো কথা হয়নি।

বিয়ের আগে একদিন হঠাৎ করে আয়াকো অর্থাৎ আমার স্ত্রী শাড়ি পরে এসে আমাকে তাক লাগিয়ে দেয়। একে তো সুন্দরী, তার উপর জাপানিজ তরুণী শাড়িতে বেশ মানিয়েছিল ঠিকই তবে শাড়ি সে জীবনে প্রথম পরেছে তা যে কোনো লোকই যারা শাড়ির সঙ্গে পরিচিত তারা ধরতে পারবে। কিন্তু আমার কাছে বেশি ভালো লাগছিল এই কারণে যে, আমার কালচার শিখে একটি বিদেশি মেয়ের আমাকে আকৃষ্ট করার জন্য কতোই না চেষ্টা।

প্রয়োজনের তাগিদেই হোক বা যৌবনের তাড়নায়ই হোক অথবা ভালোবাসার প্রতিউত্তরেই হোক, তার সে চেষ্টা বৃথা যায়নি। তার ডাকে সাড়া দিই। হয়ে যাই দুজন দুজনার।

আস্তে আস্তে আয়াকো আমাকে নিত্যনতুন চমক দিতে থাকে। তার নিজের পোশাক ছেড়ে পরা আরম্ভ করে সালোয়ার কামিজ। নাক ফোড়ানো, কান ফোড়ানো সবই করে। এর চূড়ান্ত রূপ দেয় টোকিওতে অবস্থিত জাপান ইসলামিক সেন্টারে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে।

একদিন তাকে উৎসাহ দেয়ার জন্য নিয়ে যাই টোকিও–র অভিজাত এলাকা হিরো–তে অবস্থিত Rokko Shari's নামে একটি শাড়ির দোকানে যার মালিক ইনডিয়ান শিখ। বেশ কয়েকটি শাড়ি কিনে দিই যার মধ্যে একটি ছিল তার খুব বেশি পছন্দ। শাড়িটির দাম ছিল পাচশ ডলার প্রায়। ইনডিয়ান কাতান শাড়ি। দোকানের মহিলা মালিক সুন্দর করে আয়াকো–কে শাড়িটি পরিয়ে দেয়। এবং যুগল ছবি তুলে রাখে দোকানে রাখার জন্য। অবশ্য অনুমতি নিয়েই।

স্কুল জীবনে পড়েছিলাম – সিক্ত নীল শাড়ি পরিহিতা পুষ্পিতা যৌবনা যেমন পুরুষ হৃদয়কে আন্দোলিত করে তেমনি...। আজ মনে হচ্ছে আয়াকো নীল শাড়ি পরে আমাকেই লেখকের সেই উক্তির যথার্থতার প্রমাণ দিচ্ছে। আয়াকো–কে এতোই সুন্দর লাগছিল যে, আনন্দে আমার চোখে পানি এসে যায়।

আমার প্রথম উপহার হিসেবে আয়াকোও শাড়িটি আগলে রাখে। সবাইকে বের করে দেখায় অনেকটা বাঙালি রমণীর মতো। দেখে আমার ভালোই লাগে।

১৯৯১ সালের পনেরো জানুয়ারি এডাল্ট ডে (প্রাপ্ত বয়স্ক দিবস)–এর কথা। এই দিনটি জাপানে সরকারি ছুটি থাকে। সরকারি এবং সামাজিক ও পারিবারিকভাবে এই দিন বিশ বছর পূর্ণ যুবক–যুবতীকে প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে বরণ করে নেয়। আমার হিসেবে অবাধে সব কিছু করার লাইসেন্স দেয়া যদিও তার আগেই তারা অবাধে অনেক কিছু করে থাকে।

স্থানীয় প্রশাসন আয়োজন করে এই বরণীয় অনুষ্ঠান। বিশ বছরের যুবতীরা এই দিন জাপানিজ ট্রাডিশনে কিমনো (জাপানিজ পোশাক) পরে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে

আয়াকো সেদিন আমার দেয়া নীল শাড়ি পরে Suginami Kokaido-তে যায় অনুষ্ঠানে। অসংখ্য কিমনো-র মাঝে আয়াকো-কে নীল পরী মনে হচ্ছিল। সবার দৃষ্টি আয়াকো-র দিকে।

চারদিক থেকে ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক শব্দ। ভিডিও-র লেন্স সব আয়াকোর দিকে তাক করা। বিভিন্নজনে নানান প্রশ্ন করতে লাগলো। খবর পেয়ে সাংবাদিক এসে হাজির। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সে খুব গর্বের সঙ্গে বলতে লাগলো যে, আমার হবু স্বামী বাংলাদেশি এবং শাড়ি হলো বাংলাদেশি কালচার।

সত্যি সেদিন বাংলাদেশি হিসেবে নিজেকে সার্থক মনে হয়েছিল।

ওই বছরই সামারে আয়াকোকে নিয়ে বেড়াতে যাই ভাগ্নি কানতার বাসায়। তার স্বামী ড. একেএম নওশাদ আলম। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তখন টোকিও-র বাইরে একটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত। তাদের আমন্ত্রণে যাওয়া। বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে কানতার জন্য আচার নিয়ে যাই আয়াকোর ব্যাগে করে। পথিমধ্যে কখন যে আচারের বোতল ভেঙে গেছে তা টেরই পাইনি। টের পেলাম বাসায় পৌছানোর পর যখন সব কিছু বের করা হলো তখন।

বেশ গর্বের সঙ্গে যখন সে তার পছন্দের শাড়িখানা দেখাতে গেল কানতাকে তখনই বিনা মেঘে ব্রজাঘাতের মতো আঘাত হানলো আয়াকোর হৃদয়ে। কিছুক্ষণের জন্য বাকস্বাধীনতা হারিয়ে ফেললো। তারপরই চোখ বেয়ে শ্রাবণের অঝোর ধারার মতো পানি পড়তে লাগলো। বাচ্চাদের মতো কাদতে লাগলো। আর যতো দোষ পড়লো গিয়ে আচারের ওপর। আচারের তেলে সম্পূর্ণ শাড়ির রঙ তো বদল হয়েছেই, সেই সঙ্গে আচারের তীব্র ঘ্রাণে পুরো শাড়িটাই আচার হয়ে গেছে বলে মনে হলো।

তাকে অনেক বোঝানো হলো যে, প্রয়োজনে দশটি শাড়ি কিনে দেয়া হবে। কিন্তু কিছুতেই আয়াকোকে বোঝানো যাচ্ছিল না। তার একটাই কথা, হাজারটা কিনে দিলেও সেটা তো আর প্রথম উপহার হবে না। তার প্রতি সহানুভূতির জানিয়ে আজো আমি আচার মুখে দিইনি।

এতো অনুভূতি, সহানুভূতি ও ভালোবাসার ছড়াছড়ি যেখানে ছিল সেই ভালোবাসা আজ আমাদের মধ্যে আর নেই। প্রায় আট বছর সংসার করার পর ১৯৯৮ সালের বিশ এপ্রিল আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

আমি আয়াকোর মাধ্যমে উপহার হিসেবে পাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার। অমূল্য সম্পদ দুটি বাচ্চা ইফা ও আশিককে। যদিও বাচ্চাদের পাওয়ার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সেই থেকে তাদের দুজনকে নিয়েই আছি আজো। আমিই তাদের মা, আমিই তাদের বাবা এবং আমিই তাদের বন্ধু।

আয়াকো এবং নীল শাড়ি এখন আমার কাছে শুধুই স্মৃতি। কোনো কারণে Rokko শাড়িতে গেলে ওই ছবিটি যখন দেখি তখনই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরো বেশি মনে করিয়ে দেয় পুরনো স্মৃতিকে।

টোকিও, জাপান থেকে

প্রতারণা

–ডা. কামরুল হাসান রুবেল

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তখন নারায়ণগঞ্জে আমার মেজআপার বাসায় থেকে মেডিকাল ভর্তি কোচিং করতাম।

বিসিএস পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে, পৃথিবীর বিখ্যাত প্রতারণার স্থান কোনটি? তবে এর সঠিক উত্তর হবে গুলিস্তান। তখনো পৃমিয়াম এসি বাস চালু হয়নি। করতোয়া সিটিং সার্ভিসের খুব জনপ্রিয়তা।

একদিন কোচিং শেষে বাসে ফিরছিলাম। বাসের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন। উৎস খুজতেই বিস্তারিত জানতে পারলাম। এক বৃদ্ধ মফস্বল থেকে সদ্য ঢাকায় এসেছেন। গুলিস্তান মোড়ে দাড়িয়ে ব্যস্ত নগরীর ব্যস্ততা উপভোগ করছিলেন। এমন সময় এক যুবক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চুপি চুপি আংকলকে বললো, আংকল, শাড়ি কিনবেন? খুবই দামি শাড়ি। দোকান থেকে চুরি করে এনেছি। পুলিশ দেখে ফেললে বিপদ। তাড়াতাড়ি করুন।

বৃদ্ধ লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। দুটো শাড়ির দাম চাইলো এক হাজার টাকা। বৃদ্ধ বিজ্ঞের মতো দুইশ টাকা বলতেই তিনি দিয়ে দিলেন। টাকা হাতে পেতেই বিক্রেতা জনস্রোতে হারিয়ে গেল।

বৃদ্ধের মুখে বিজয়ের হাসি। কিন্তু এ হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। এতো শস্তায় এতো দামি শাড়ি! যাত্রীদের তদন্তেই আসল ঘটনা বেরিয়ে এলো। নতুন স্টিকার লাগানো, চমৎকার প্যাকিং আর কড়া মাড় দেয়া, ইস্ত্রি করা শাড়ির ভাজ খুলতেই দেখা গেল চটকদার শাড়িটা মোটেও নতুন নয়। স্থানে স্থানে ছেড়া। কোথাও কোথাও আবার হাতে সেলাই করে জোড়া দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। অদ্ভুত প্রতারণা।

বৃদ্ধ অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন। এমন প্রতারণায় তিনি বিস্মিত। অনেক আশা ছিল বাড়ি গিয়ে প্রিয়জনদের দামি শাড়ি উপহার দেবেন।

শাহবাগ, ঢাকা থেকে

সামাজিক অবস্থান

– রুবাইয়্যাৎ মোর্শেদ

মা বাবা দুজনেই সরকারি চাকরিজীবী। বাসায় বিশ্বস্ত কাজের লোক রয়েছে। তাই চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু একটাই, মাথার ওপর অদৃশ্য কর্তব্য আর ঋণের বোঝা। খুব সাধারণ একটা মধ্যবিত্ত চিত্র। ঈদ কোরবানিতে আমরা পাচ ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন এবং নিজেদের পোশাক কিনতে স্নায়ুবিক ক্যালকুলেটারে বেশ চাপ যেতো মা বাবার। অটোবায়োগ্রাফি লিখছি না। শাড়িও আছে অনেক শরতের শাদা মেঘের মতো।

শোনা কথায় জানতে পেরেছি, ছয় মাস বয়সে আমাকে রেখে মা বিএড ট্রেনিংয়ে চলে যান। মায়ের অভাব অনেকটা বুঝতে দেয়নি ময়লা শাড়ির আচলে বেধে রেখে সেই বিশ্বস্ত কাজের মহিলা।

আমাদের কাছে সে *আকলিমার মা* নামেই পরিচিত। আসল নাম এখনো অজানা। শাড়ির আচল যখন সার্বজনীন তখন পার্থিব সম্পর্ক ভিত্তিহীন মা। স্নেহ,মায়া, মমতা, ভালোবাসা কোনো নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ নেই।

তারিখটা মনে নেই, তবে রোজার ঈদ তা বেশ মনে আছে। ঈদের কেনাকাটা সমাপ্তির পথে। চোখ লজ্জায় হোক আর কর্তব্য বোধে হোক খালা মানে আকলিমার মায়ের জন্য শাড়ি কেনার তাগিদ দেখা দিল সবার শেষে। সামাজিক অবস্থানের ছায়া যে কেনাকাটাতেও বিদ্যমান তা তখন বুঝিনি। হিন্দু দোকানি নিচের তাক থেকে খুব সাধারণ একটা শাড়ি বের করলেন।

আব্বা শস্তা শাড়ির সৌন্দর্য মৌখিকভাবে বৃদ্ধিতে ব্যস্ত আর কাপড় পছন্দের দায়িত্ব পড়লো আমার ওপরে। প্রিয় মানুষের জন্য প্রিয় জিনিসটা সবারই চাই।

যে শাড়িগুলো আমাকে দেখানো হলো তাদের সৌন্দর্য এবং দাম দুটোই খালার প্রতি আমার মাতৃপ্রতিম ভালোবাসাকে বিদ্রূপ করছে ভেবে নিজেই উঠে দোকানিকে উপরের তাক থেকে ভালো একটা শাড়ি দেখিয়ে বললাম, এটা নামিয়ে দিন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে শাড়িটা পছন্দ করেছি তার দাম আমার মায়ের জন্য নেয়া শাড়িটার প্রায় দ্বিগুণ।

হতবাক দোকানি এবং মা বাবা শুরু করলেন আমার পণ ভাঙানো পর্ব। চকলেট থেকে শুরু করে সাধ্যের মধ্যে সব কিছুই তারা দিতে চেয়েছিলেন। অন্যদিন হলে হয়তো সামান্য চকলেটেই পটে যেতাম। কিন্তু সেদিন তা সম্ভব হয়নি। অবস্থা এমন দাড়ালো যে, নিজের জন্য কেনা পোশাক উৎসর্গ করে চুপচাপ বসে আছি শুধু শাড়িটার জন্য। নিরুপায় বাবা অবশেষে ওই শাড়িটাই নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ঘটনার ইতি এখানেই নয়, বাসায় ফেরার পর খালা সব শুনে আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, তুই এই রকম করলি কেন?

অতশত হিসাব বোঝার বয়স তখনো আমার হয়নি। কিন্তু খালা ঠিকই বুঝেছিলেন এই খুদে বিদ্রোহী তার মা বাবার হিসাবের খাতায় কিছু পরিবর্তন এনেছে। মজার ব্যাপার হলো খালা যতোদিন আমাদের বাসায় কাজ করেছেন কোনোদিন সেই শাড়িটা তাকে পরতে দেখিনি। মালিকের প্রতি বিশ্বস্ততা, ভয়, না সামাজিক ভেদাভেদ, সচেতনতা, কোনটি খালাকে বিরত রেখেছিল শাড়ি পরিধানে সে রহস্য চমৎকার আড়াল করেছে এগারো বারো হাত সুতার বুনন।

খালা এখনো মাঝে মধ্যে বাসায় আসেন, বিলিয়ে যান নির্ভেজাল ভালোবাসা। কাছে নিয়ে চুমু খান পান–খয়েরে লাল চুপচুপে ভেজা ঠোটে। কালো বোরখার আড়ালে ময়লা শাড়িতে মেখে থাকা মাতৃস্নেহে এতোটুকু ঘাটতি নেই। শুধু খুজে পাই না শৈশব তাকে দেয়া সেই শাড়িটা।

রাজশাহী থেকে

দক্ষ

আমি তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক বিভাগের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। বাড়ি ক্যাম্পাস থেকে প্রায় একশ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। প্রেম করেছিলাম এলাকার কলেজের একই বিভাগের রূপের রানী এক সহপাঠিনীর সঙ্গে।

দুরন্তভাবে প্রেম কখনো শহরের অলি–গলি, কখনো বন্ধু–বান্ধবের মেস বা বাসা আবার কখনো গ্রামের বিল পাড়ি দিয়ে গ্রামীণ বন্ধুর বাসায়।

এই দুরন্তপনার মাঝে তাকে একদিন প্রস্তাব দিলাম ইউনিভার্সিটিতে বেড়াতে আসার জন্য। সে রাজি হয়ে গেল।

আমি ইউনিভার্সিটি থেকে বাইশ তেইশ কিলোমিটার দূরে মেসে থাকতাম। নির্দিষ্ট দিনে দুজন ক্যাম্পাসে বেলা দশটার মধ্যে এসে পৌছাই। এবং বারোটার মধ্যে মেসে পৌছাই। সেখানে দুপুরে খাওয়া–দাওয়ার পর দুজন মিলে এক রুমে ঢুকলাম। তার পরনে ছিল হালকা হলুদ রঙের কাতান শাড়ি।

বেডে শুয়ে পড়লাম, সে আমার পাশে বসেছিল। তাকে মাথা টিপে দিতে বললাম, সে তাই করলো। তাকে আস্তে আস্তে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

এভাবে কতোক্ষণ ছিলাম মনে নেই। যখন হুশ হলো তখন দেখি দুজনার খোলা বুক একাকার হয়ে মিশে আছে। বস্তুত তার বুকের মাপ সহস্তে বহুবার নিলেও স্বচোখে সেদিনই পুরোপুরি দেখলাম যার বর্ণনা কবি, সাহিত্যিকরা ভালো দিতে পারবেন। সে চেষ্টা করা আমার জন্য বাতুলতা মাত্র।

শেষে যখন আমরা চলে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম তখন সে প্রস্তাব দিল তার কাপড় পরিয়ে দিতে। ব্রা এবং ব্লাউজ ঠিক মতো পরালাম। কিন্তু বিপত্তি হলো শাড়ি পরাতে গিয়ে। লুঙ্গির মতো করে সমস্ত শাড়ি তাকে পেচিয়ে দিলাম, বুকের জন্য অবশিষ্ট কোনো কাপড় রইলো না। এভাবে দুই তিনবার বৃথা চেষ্টা করলাম। শেষবার আবার কাপড় পরানোর ছলনায় কিছুক্ষণ তার শরীরের উত্তাপ নিলাম। তারপর সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, থাক, আর পরাতে হবে না।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সে কিভাবে শাড়ি পরে। তাকে বললাম পরবর্তী দিন এমনি করে তাকে শাড়ি পরিয়ে দেবো যা এখন শিখে রাখলাম।

কিন্তু পরবর্তী দিনের আর কোনো সুযোগ আমাকে সে দিল না। আমাকে মাদকতাপূর্ণ চিঠি দিয়ে আমার অগোচরে তার ভাইয়ের বন্ধুকে শাড়ি পরানো শিখিয়েছিল সে।

অবশেষে সেখানেই বিয়ে করলো। আমার অপরাধ আমার পায়ের তলায় মাটি নেই। হয়তো বা সেই ছেলে শাড়ি পরানোয় আমার চেয়ে দক্ষ ছিল। এখন তার জন্য কোনো দুঃখ নেই, জীবন আরো সুন্দরভাবে চলছে।

হয়তো তার অবহেলাই আমার জীবন সুন্দর হতে সাহায্য করেছে। সে সুখী হোক।

নামবিহীন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

দরাদরি

–স্বজন

ক্রেতা : এই শাড়ির দাম কতো?

দোকানদার : নয়শ পচাত্তর টাকা।

ক্রেতা : ভাই, এতো দাম বেশি চান কেন?

দোকানদার : কতো বেশি চাইছি?

ক্রেতা : অনেক বেশি। সুতি শাড়ির দাম এতো নাকি?

দোকানদার : সুতি শাড়ি আরো বেশি দামের আছে।

ক্রেতা : আপনি কতো দামে বিক্রি করবেন?

দোকানদার : আপনি দাম বলেন।

ক্রেতা : দুইশ পয়ত্রিশ টাকা দেবেন?

দোকানদার : না ভাই, এই দামে শাড়ি পাবেন না।

ক্রেতা : দেখি পাই কি না।

দোকানদার : বসেন, ওঠেন কেন?

ক্রেতা : আপনি দুইশ পয়ত্রিশ টাকায় দেবেন?

দোকানদার : আপনি রাগ হয়ে যাচ্ছেন, একটু বাড়িয়ে দেন।

ক্রেতা : দুইশ পঞ্চাশ টাকা দেবেন? চলে যাই।

দোকানদার : দেন, টাকা দেন।

জিয়া সুপারমার্কেট, ভোলা থেকে

শান্তামণি

–মোহাম্মদ মিনারুল ইসলাম

শাড়ি!

শাড়ির কথা মনে হলেই কোথা থেকে এক উত্তাল অশ্রু ঢেউ এসে আমার দুই চোখ প্লাবিত করে। আপনজন হারানোর বিয়োগ ব্যথায় মনটা হু হু করে ওঠে। যায়যায়দিনের শাড়ি বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে ছয় বছর আগের চার বছর বয়সের ছোট্টবোন শান্তামণির কথা। আমরা একটা বোন চাই, এ আশা পূরণের জন্যই বাবা–মায়ের শেষ চেষ্টার ফসল আমাদের শান্তামণি।

বিদেশ চলে আসবো। পোশাক–আশাক গুছিয়ে নিচ্ছি। বাড়ির সকলের মন খারাপ। যে ভাইয়া আমি এক মুহূর্ত শান্তামনিকে ফেলে থাকতে পারিনি সেই শান্তামণির মুখের দিকে তাকাতেই আমারও চোখে জল চলে এসেছে। শান্তামণি কিছু বুঝতে না পারলেও কেন জানি ভীষণ মন খারাপ করে আছে। চার বছরের হলে হবে কি, ছোট শাড়ি তার প্রিয় পোশাক। শাড়ি পরিয়ে দিলে আনন্দে ঘর

মাতিয়ে তোলে। বাবার সামনে গিয়ে তোতলা মুখে বলে, *আমি তুমাল মা।* বাবা আমার আনন্দে জড়িয়ে ধরে বলে, হ্যা, সত্যিই তুমি আমার মা।

ধীরে ধীরে মনটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে শান্তামণির। কিছুক্ষণ পরে আমি বিদায় নেবো। তার মুখে হাসি দেখার জন্য লাল টুকটুকে শাড়িটা পরিয়ে দিলাম। কিন্তু না, শান্তামণি না হেসে কচি মুখে আমাকে প্রশ্ন করলো, *ভাইয়া, তুমি কুতায় দাবে?*

চোখে জল নিয়ে বললাম, ভাইয়া, আমি তোমার জন্য ভালো ভালো শাড়ি আনতে বিদেশ যাবো, তুমি শাড়ি পরবে না?

শান্তামণি এবার মহা খুশি। বিদায়ের সময় আমাকে বার বার বলেছিল, শাড়ি নিয়ে আমি যেন তাড়াতাড়ি ফিরি।

হ্যা, সত্যি আমি কচি মুখের বায়না ভুলিনি। প্রথম মাসের বেতন পেয়ে আমার সোনাবোন শান্তামণির জন্য খু-উ-ব সুন্দর একটা শাড়ি কিনেছিলাম যেটা আমাকে এখন শুধুই কাদায়, কষ্ট দেয়, ভীষণ কষ্ট দেয়।

বর্ষাকাল। বিকেলের মেঘ ভাঙা রোদ। ছোট্ট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার লক্ষ্মী বোন শান্তামনি শাড়ি পরে পুকুর পাড়ে খেলছিল। সকলের চোখ ফাকি দিয়ে কখন যে পুকুরের গহীন তলে চলে গেছে তা কেউ টের পায়নি!

ভাইয়ার নিয়ে যাওয়া শাড়ি পরার লোভে বেচে থাকার তীব্র চেষ্টা থাকলেও ব্যর্থ হয়েছে। পানির শেষ তলে গিয়েও হয়তো ভাইয়া ভাইয়া, করে চিৎকার করেছে। কিন্তু এ হতভাগা ভাই আমি শুনতে পাইনি। আগ্রাসী পুকুর আমার শখের শান্তামণিকে চিরদিনের জন্য গ্রাস করার পর ছেড়ে দিয়েছিল। আজ বার বার পরম ব্যথায় মনে পড়ছে শান্তামণির শাড়ি চাওয়া, শাড়ি পরার কথা। সোনাবোন আমার, তুমি কি বুঝতে পারছো, যায়যায়দিন শাড়ি নিয়ে লেখা চেয়েছে। কি লিখবো, তুমি থাকলে আনন্দে প্রাণ খুলে লিখতাম তোমার শখের কথা, তোমার শাড়ি পরার কথা। লিখতাম তোমার বিয়ের শাড়িটা কেমন হবে। তোমার সেই শাড়িটা মাঝে মধ্যে আমার চোখের জলে ভিজিয়ে রাখি। কে জানে তুমি কিভাবে পুকুরে পড়েছিলে! হয়তো কচি পায়ে শাড়ি জড়িয়ে হোচট খেয়েছিলে।

কুয়েত থেকে

পহেলা বৈশাখে

–শিমু

নকশি শাড়ি, রেশমি চুড়ি আর কপালে টিপ পরার সাধ বাঙালি নারী লালন করে তার শৈশব থেকে। প্রকৃতি পাল্টায়, সেই সঙ্গে শাড়ির রঙও পাল্টায়। প্রকৃতির রঙ-এর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে নারী নিজেকে মোহনীয় রূপে সাজিয়ে তোলে। বৈশাখ বরণ উৎসবে তাই শাড়ির রঙ হলো লাল ও শাদায় মাখামাখি এবং বসন্তে নারী বাসন্তী, সবুজ ইত্যাদি রঙ-এর শাড়িতে নিজেকে অপূর্ব সাজে সাজিয়ে তোলে।

শৈশবে অন্যান্য বাঙালি মেয়ে শিশুর মতো আমারও খুব ইচ্ছা হতো কবে বড় হবো, কবে বড়দের মতো শাড়ি পরে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ঘুরে বেড়াবো। শৈশবে আমার এই গোপন বাসনাটি নিবৃত্ত করতাম মা–বাবা বাসায় না থাকলে। মা–বাবা কোথাও বেড়াতে গেলে বা প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আলনা থেকে মায়ের শাড়ি নামিয়ে পরতে শুরু করতাম। একটার পর একটা শাড়ি পরে যেতাম আর আয়নার সামনে গিয়ে দাড়াতাম। অবশ্য কারো আসার আওয়াজ পেলে তৎক্ষণাৎ শাড়ি খুলে ফ্রক পড়ে ভদ্রমেয়ে হয়ে যেতাম।

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। একদিন আমার মায়ের একটি শাড়ি পরে ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি। হঠাৎ আব্বা বাইরে থেকে এসে আমাকে দেখে বললেন, বাহ! শাড়ি পরায় তোমাকে তো বেশ বড় বড় লাগছে।

আমার কেন জানি তখন মনটা খারাপ হয়ে গেল। আব্বার কাছে সব সময়ই ছোট এবং আদরের থাকতে চাই। কখনোই বড় হতে চাইনি। শাড়ির কারণে আমাকে যদি বড় দেখায় তাহলে শাড়ি পরবো না। তাছাড়া বড় দেখা গেলে তাড়াতাড়ি পর করে দেয়ার চিন্তাটাও মাথায় আসতে পারে এ ভয় থেকে লুকিয়ে শাড়ি পরার খেলা বন্ধ করে দিলাম।

তারপর অনেক সময় গড়িয়ে গিয়েছে। স্কুল–কলেজের গণ্ডি ছেড়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। আমার আগের অনেক ধ্যান ধারণাও পাল্টে গেছে। নবআবেগ, নবপুলক আর চেতনায় আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। এবং কয়েকদিন বাদেই পহেলা বৈশাখ। আমি এবং আমার অন্য সব মেয়ে বন্ধুরা ঠিক করলাম বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আমরা সবাই একই রঙ ও ডিজাইনের শাড়ি পরবো এবং রমনার বটমূল, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, বাংলা একাডেমি ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে ঘুরে গান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপভোগ করবো।

আমার কোনো শাড়ি নেই। তাছাড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে শাড়ি পরতে হবে। তাই এক বিকেলে মাকে নিয়ে নিউ মার্কেট থেকে শাড়ি কিনে নিয়ে এলাম। বলা বাহুল্য, এটিই আমার জীবনে নিজে কেনা প্রথম শাড়ি। আর এ কারণে এর সঙ্গে আমার অন্য রকম আবেগ অনুভূতি জড়িত। একটু পর পর শাড়ি খুলে দেখেছি। নিজের সামনে মেলে ধরে আয়নার কাছে গিয়ে দাড়িয়েছি আবার সযত্নে ভাজ করে তুলে রেখেছি।

পহেলা বৈশাখের আগের রাতে পরদিন নতুন শাড়ি পরা, আনন্দ, উত্তেজনা আর ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার চিন্তা নিয়ে ঘুমাতে গেলাম। ফলে রাতে ভালো ঘুম হলো না।

যাহোক, পহেলা বৈশাখে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। মায়ের সাহায্য নিয়ে শাড়ি পরলাম এবং আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা সেরে সকাল ছয়টার দিকে আমার ছোটবোনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রিকশায় করে আমরা যাচ্ছি রমনা পার্কের দিকে। সেখানে পূর্ব নির্ধারিত একটি জায়গায় আমার বন্ধুরা একে অন্যের জন্য অপেক্ষা করবে।

প্রভাত সমীরণে, পুলকিত চিত্তে মুক্ত বিহঙ্গের মতো আমরা ছুটে চলেছি। কোনো দিকে খেয়াল নেই। কেবলই আনন্দ, কেবলই ছুটে চলা। রিকশাচালককে তাগাদা দিচ্ছি জোরে চালানোর জন্য। আমাদের

রিকশা ছুটে চলেছে ঝড়ের বেগে। আমরা দুই বোন বাহ্য জ্ঞান শূন্য। কখন যে আমার শাড়ির আচল রিকশার চাকার সঙ্গে পেচিয়ে গেছে টেরই পাইনি। যখন টের পেলাম তখন আর সময় নেই। তাল সামলাতে না পেরে ধপাস করে চলন্ত রিকশা থেকে পড়ে গেলাম। পাথরের পিচঢালা পথে আমার হাত–পা–মুখ থেতলে ছুলে রক্তে একাকার হয়ে গেল।

নিজের শারীরিক কষ্টের কথা তখন আর খেয়াল নেই। শাড়ি সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। লজ্জায় মুষড়ে পড়লাম। অন্যান্য রিকশা যাত্রী এবং পথচারীরা আমাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো। ফলে আমার চারপাশে ছোটখাটো একটি ভিড় জমে গেল। এবং আমার শখের শাড়ি তখন ছিন্নভিন্ন। রাস্তা থেকে উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করলাম এবং টের পেলাম আমার ডান পা–টা কোনো ক্রমেই উঠাতে পারছি না। বুক ফেটে কান্না আসছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলাম। আমার বোন এবং অন্য এক মহিলার সাহায্যে বসে বসেই কোনোক্রমে ফুটপাথের ওপর চলে এলাম।

পাশেই ছিল পুলিশ ফাড়ি। আমার বোন সেখানে গিয়ে বাসায় ফোন করে দিল। প্রায় বিশ মিনিট পর মা আব্বা গাড়ি নিয়ে এলেন এবং আমাকে তুলে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। দুপুরে বন্ধুরা বাসায় ফোন করে জানতে পারলো আমি হাসপাতালে। বিকেলবেলা সবাই মিলে ফুল নিয়ে আমাকে দেখতে এলো। অনেক কষ্টের মধ্যেও তাদের দেখে আমার মনটা ভালো হয়ে গেল। এরপর পুরো ছয় মাস প্লাস্টার করা পা নিয়ে বিছানায় শুয়ে, বসে কাটিয়েছি। কি কষ্টকর সে অনুভূতি যা মনে পড়লে আজো শিহরিত হই।

রায়েরবাজার, ঢাকা থেকে

কাপড়

–মউ সিং

আমার শৈশব–কৈশোর কেটেছে গ্রামের গোলপাতা ছাওয়া ছোট্ট ঘরে ও প্রচণ্ড অভাব অনটনের ভেতরে। আমার বাবা একজন হাই স্কুল শিক্ষক। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। তার আয়ে আমাদের এগারো ভাইবোনের খাওয়া ও পড়াশোনার খরচ চালাতে পারতেন না। এমনো দিন গেছে, আমি ও আমার ছোটভাই খাবারের কষ্টে দশ মাইল দূরে হেটে রিলিফ এনেছি। তারপরও পড়াশোনা ছাড়িনি একমাত্র মায়ের ত্যাগ ও উৎসাহের জন্য। মায়ের ত্যাগ বলছি এই কারণে যে, মা আমাদের পড়াশোনার জন্য তার শেষ সম্বল স্বর্ণ বিক্রি করেছিলেন।

এভাবেই জীবন নদীর উত্তাল ভাঙনময় বাকগুলো পেরিয়ে ১৯৯৬ সালে এমকম পাস করি। আল্লাহর রহমতে ১৯৯৭ সালে ঢাকায় একটি প্রাইভেট কম্পানিতে জুনিয়র পদে চাকরি পাই এবং বর্তমানে আমি মধ্য সারির অফিসার। বাবা–মায়ের দোয়া নিয়ে আগস্ট মাসের শেষে চৌধুরী পাড়ায় তিনশ পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় ডাবলিং হিসেবে থাকবো শর্তে একটি মেসে উঠলাম। মেসে নিয়ম সকালে, অর্ধ দুপুর এক রাতে এক মিল হারে। আমি পয়সা বাচানোর জন্য দুপুরে খাবার না এনে রাস্তার পাশে সাত আট টাকায় ভর্তা ডাল দিয়ে ভাত খেতাম। এভাবে খেতে খেতে ভাবতাম কিছু সঞ্চয় হলে দোষ কি?

প্রথম মাসের বেতন তিন হাজার টাকা নিয়ে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে কতো যে বাজেট করেছি। কিন্তু মাসের শেষে দুই তারিখে যখন বেতন পেলাম তখন টুকটাক দেনা, মেসের ভাড়া ও মিল চার্জ দেয়ার পর দেখি হাতে আছে মাত্র এক হাজার আটশ টাকা। এই টাকা দিয়ে পরের মাসের মেসের খরচ ও অফিসে যাতায়াত খরচ হিসাব করে দেখি হাতে আটশ টাকা। অথচ আসার সময় দেখেছি বাবা–মায়ের জন্য শহর থেকে পুরানো শাড়ি কিনেছেন এবং বাবার পরনে রিপু করা লুঙ্গি, ছোট ভাইবোনদের পরনে বড়লোক আত্মীয়স্বজনদের দেয়া পুরনো কাপড়। আটশ টাকা হাতে নিয়ে মেসের বাথরুমে গিয়ে কাদলাম এজন্য যে, এ টাকা দিয়ে কাকে কি দেবো এবং কিভাবেই বা গ্রামের বাড়ি যাবো। তাছাড়া আসার সময় বাবা বলেছেন, প্রথম বেতন পেয়ে গ্রামের মসজিদে ছোট মিলাদ পড়াবেন। হঠাৎ মনে পড়লো, পল্টনের দোকানে কালো কাপড়ে শাদা লেখা বিজ্ঞাপন *স্বল্পমূল্যে জাকাতের কাপড় পাওয়া যায়।* পরের দিন অফিস থেকে সকাল সকাল ছুটি নিলাম বাড়ি যাবার জন্য। অফিস থেকে বের হয়ে গেলাম পল্টনে জাকাতের কাপড়ের দোকানে, সেখানে মায়ের জন্য কিনলাম আকাশি ও বাসন্তী রঙের ছাপার দুটি কাপড় এবং বাবার জন্য একটি লুঙ্গি ও ছোটবোনের জন্য পয়তাল্লিশ টাকা দামের একটি কৃম এবং কিছু খেজুর ও চকোলেট। বাকি টাকা নিয়ে বিকেলে সদরঘাট থেকে লঞ্চে বাড়ি রওনা দিলাম। মনে মনে স্রষ্টাকে ডাকলাম মা–বাবা যেন আমার জীবনের প্রথম উপহার পছন্দ করেন।

খুব সকালে গ্রামের লঞ্চ ঘাটে পৌছালাম। দেখি সবাই নৌকায় যে যার বাড়ির ঘাটে যাচ্ছে। আমি টাকা বাচানোর জন্য আমার বাক্স–পেটরা মাথায় আধো আধারে হাটা দিলাম। বাড়ি যখন পৌছালাম তখন আমি ঘামে নেয়ে গিয়েছি হালকা শীতে। মা নিজ হাতে গায়ের শার্ট খুলে ঘাম মোছালেন এবং ছোট সময়ের মতো কপালে চুমু খেতে খেতে কাদলেন। বাবার চোখে জল দেখলাম এই প্রথম। ছোট ভাইবোনদের উৎসুক প্রশ্ন, ঢাকা কেমন, চিড়িয়াখানা দেখেছি কি না ইত্যাদি। আমার নেয়া খাবার বের করে মা সবাইকে দিলেন এবং এক সময় আমি বের করলাম আমার প্রথম উপহার। ভয়ে, লজ্জায় গলা শুকিয়ে গেছে কি হবে এই ভেবে। কিন্তু ঘটলো উল্টো ঘটনা। মা–বাবা এই কাপড় এতো পছন্দ করলেন যে, মা ওই সময়ই নতুন কাপড় পরলেন।

বাবাকে মা বললেন, তুমি এ পর্যন্ত এ রকম রঙয়ের সুতার কাপড় কিনতেই পারোনি এবং বাবাকে আরো বললেন, আজ শুক্রবারে এই লুঙ্গি পরে নামাজ পড়বে।

বাবাও খুশি হয়ে বললেন, তুই ঢাকায় কতো কষ্ট করিস, এতো দামি লুঙ্গি কেন আনতে গেলি।

এরপর ধীরে ধীরে আমার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। প্রতি বছর মা–বাবাকে কাপড় দিয়েছি বেশি দাম দিয়ে। কিন্তু মায়ের এক কথা, কি সব কাপড় কিনিস। প্রথমবারের মতো ভালো কিনতে পারিস না?

রামপুরা, ঢাকা থেকে

প্রতিজ্ঞা

–নিলুফার কবির

আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগের কথা। বিয়ে জীবনের বয়স তখন আট বছর। সেদিনের সকালের কথা আমার মনে থাকবে আজীবন। সংসার জীবনে মানুষের কতো ঘটনাই ঘটে। কয়টাই বা মানুষ মনে রাখে? সেদিনের সেই সুন্দর সকালে পারিবারিক একটা তুচ্ছ ঝামেলাকে কেন্দ্র করে আমার কর্তামশাই চড়াও হলেন আমার ওপর। এক কথা দুই কথা – এভাবে ঝগড়া বেধে গেল। কথার পিঠে কথা গেথে আমিও কম করিনি।

এক পর্যায়ে সে অহেতুক উত্তেজিত হয়ে গেল। সামান্য ব্যাপারে তার অমন উত্তেজিত হওয়াকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। শেষে আমি হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলাম। রাগে অভিমানে আমার দুই চোখ দিয়ে শ্রাবণের ঝরনা ধারা বয়ে যেতে লাগলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে চুপ করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলাম। এদিকে তার অফিস যাবার সময় হয়ে গেল। তার এক অভ্যাস বিয়ের পর থেকে দেখে আসছি, যতো কিছুই হোক অফিসে যাবার সময় আমাকে না বলে কিছুতেই ঘর থেকে বের হয় না। এবং এ সুযোগটাই নিয়ে রান্নাঘরে চুপ করে বসে রইলাম। জরুরি কাজ। তখনি কাজে না গেলে ঝামেলা হবে। কি আর করে বেচারা। নিজের রাগ থামিয়ে আমার সামনে এসে ডাকাডাকি শুরু করে। আমিও নাছোড়বান্দা, তার ডাকে সাড়া না দিয়ে উল্টো কান্নার আওয়াজটা আরো বাড়িয়ে দিলাম। আমার এ অবস্থা দেখে মনে হয় তার খুব খারাপ লাগছিল।

এদিক–সেদিক তাকিয়ে সে আমার হাত ধরে এক টানে তার কাছে নিয়ে এলো। চোখ মুখ মুছে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে *আমি আসি* বলে বের হয়ে গেল। সেদিন তার ব্যবহারে আমারও মনটা খুব খারাপ লেগেছিল। অফিস থেকে তিন চারবার ফোন করেছিল। একবারও কথা বলিনি। দুপুরে ভেবেছিলাম কিছুই খাবো না। কিন্তু আমি আবার ক্ষিদে সহ্য করতে পারি না। তাই কোনো রকমে একটু খেয়ে শুয়ে রইলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। হঠাৎ এক আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। লাফ দিয়ে উঠে দেখি বিছানার পাশে কর্তামশাই হাজির। তাকে দেখে আমি তো অবাক। অন্যদিন বাসায় প্রায়ই তার রাত হয়। আর আজকে পাচটা।

তাকে দেখে আমি অন্য রুমে যাবার চেষ্টা করতেই সে জোর করে আমাকে পাশে বসায়। চোখ মুখ তখনো আমার বেশ ফোলা। সকালের সেই ঘটনার জন্য ক্ষমা চায়। এবং একটা শাড়ির প্যাকেট আমার সামনে রাখে। সে ভেবেছিল আমি তক্ষণি শাড়ির প্যাকেটটা খুলবো। কিন্তু আমি তা না করে চুপচাপ বসে আছি। একটা কথাও বলছি না দেখে সে জোর করে শাড়ির প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে খুলিয়ে তখনি শাড়িটা আমাকে পরিয়ে ছাড়লো এবং প্রতিজ্ঞা করলো অফিস যাবার সময় আর কোনো দিন অমনটি করবে না।

তার এই ছেলেমানুষি দেখে আমি আর রাগ করে থাকতে পারলাম না।

আশ্চর্য! একটা শাড়ি মেয়েদের মনটাকে এভাবে ভুলিয়ে দিয়ে দিতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

নতুন শাড়ি পরে আমি সালাম করলাম। সে সস্নেহে আমাকে কাছে টেনে নিল।

এরপর কতো যে শাড়ি কিনেছি! কিন্তু সেদিনে সেই শাড়িটার কথা কোনোদিনও ভুলবো না। ঝগড়ার পর শাড়ি পেয়ে কি যে খুশি হয়েছিলাম। সত্যি কি ছেলেমানুষই না ছিলাম তখন।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

কেন ?

–রুমিন

ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতাম, স্বপ্নের রাজপুত্র আসবে, লাল বেনারসি পরিয়ে নিতে যাবে আমার স্বপ্ন রাজ্যে। তার আদর–সোহাগে ভুলে যাবো আমার ছোট–বড় সকল দুঃখ।

একদিন তিনবার কবুল বলে আমার বিয়ে হয়ে গেল লাল বেনারসি ছাড়াই। কারণ ছেলে বেকার।

তারপর অপেক্ষার পালা। ভালোবাসা দিবস আসে, অপেক্ষা করি। আসে জন্মদিন, আসে ঈদ, আসে বিয়েবার্ষিকী। আমার অপেক্ষার পালা শেষ হয় না। ভালোবেসে লাল গোলাপ অথবা শাড়ি কোনোটাই আমাকে দেয় না সে। মাসে তার আয় হতো পাচ ছয় হাজার টাকা। তারপরেও আমাকে শাড়ি দেয়ার মতো টাকা তার ছিল না।

কিছুদিন পর সে সরকারি ভালো চাকরি পেল। আশা নিয়ে বসে থাকলাম এবার বোধহয় পাবো আমার অনেক দিনের স্বপ্নের শাড়িটি। কিন্তু না। এবারও আমার আশা বিফলে গেল।

গভীর রাতে যখন আমার শরীরটাকে প্রয়োজন পড়তো তখন ভালোবাসার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে কাছে টানতো। প্রয়োজন ফুরালে মনে রাখতো না কোনো কিছু। প্রথমে আমাকে বোঝাতো সামর্থ হলে কিনে দেবো। তারপর ধীরে ধীরে মুখোশ খুললো। আমাকে বলতো, শাড়ি–গহনার যোগ্য আমি নই।

তারপরও প্রয়োজনে আমাকে ব্যবহার করতো। আর আমি বেহায়া মেয়েমানুষ যখন আবেগে একাকার হয়ে পুরনো কথা ভুলে তার কাছে কিছু আবদার করতাম তখন সে তার কথার তীর বিধিয়ে আমাকে বোঝাতো, ওসব পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।

একদিন রাগে, দুঃখে, অপমানে ঘর ছাড়ি। অভিমানী আমি আশা করেছিলাম সামনে আমাদের বিয়ের তারিখে সে শাড়ি দিয়ে আমার রাগ ভাঙাবে।

কিন্তু সে আসে না।

তার বেশ কিছুদিন পর সে আসে। কথার মায়াজালে আমাকে ভুলিয়ে ভোগ করে। আমার উপোসি শরীর তার ছোয়ায় ধরা দেয় তার হাতে। সেদিন রাতেও অনেক কিছু দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর আমি বোকা মেয়েমানুষ তার কথায় বিশ্বাস করে সপে দিই নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে।

আমাদের বাড়ি থেকে ফিরে গিয়ে সে আমার নামে শারীরিক অক্ষমতার এবং চুরির অভিযোগ দিয়ে তালাকনামা পাঠায়।

সেই তালাকনামা দেখে ইচ্ছা হয় শাড়ি শরীরে জড়িয়ে পুরুষের জন্য না সেজে গলায় পেচিয়ে মরি। যে স্বামী বিয়ের চার বছরে স্ত্রীর প্রতি সামান্য কর্তব্য পালন করে না এবং একচুল পরিমাণ স্বর্ণ যে স্ত্রীকে দেয় না সেই আবার বিশ ভরি গহনা ও শাড়ি–চুরির অভিযোগ তোলে কি করে?

আমার মা যখন আমাকে এসে দেখান তোর আব্বু আমার জন্য আজ পাচটা শাড়ি এনেছে তখন ঘরে এসে কাদি। আমার দুই বছর আট মাসের মেয়ে আমাকে সান্ত্বনা দেয়, মা কেদো না, আমি তোমাকে শাড়ি কিনে দেবো আর একটা আংটি বানিয়ে দেবো।

চব্বিশ বছর বয়সে নতুন করে আমার মেয়ের কথায় স্বপ্ন দেখি। জানি না আমার এই স্বপ্ন পূরণ হবে কি না।

আজকাল পত্রিকা খুললেই ধর্ষণের খবর দেখি। আমার দুই বছর আট মাসের কন্যাসন্তানের চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারি না। মামা, খালু, চাচা, কারো কাছে দিয়ে দুই কদম সরতে পারি না। কেন এমন হলো পৃথিবী?

কেন বিয়ে হতে দুইজন লাগে আর তালাক দিতে প্রয়োজন হয় একজনের?

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কুরবানির গরু

–মোহাম্মদ দবিরুল ইসলাম লিটন

এই মাগী, শাড়িটা কি করলি বল?

না, আমি নিইনি।

আবার বলিস নেসনি। তাহলে কি হাওয়ায় উড়ে গেল নতুন শাড়িটা? আমি নিজে ওই বাশের ওপর ধুয়ে রোদে দিলাম সকালে। এখন বলিস নেসনি। তুই নিয়েছিস মাগী। আমার স্বামীকে জাদু করে গলায় ঝুলে পরেছিস। জেনেশুনেও সতীনের সংসারে এসেছিস আমার সংসার ধ্বংস করার জন্য। আমি কি বুঝি না মাগী। এই বলে চুল ধরে মারধর করছে বড় সতীন তার ছোট সতীনকে।

রাগে, দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায় ছোট সতীন তার বাবার বাড়ি। এর কিছুদিন পর স্বামী দেয় তাকে তালাক। আমি তখন ছোট। ক্লাস সিক্স–এ পড়ি। আমাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী ভাড়াটে তারা। এ ঘটনা তৎক্ষণাৎ আমার কিছু মনে না হলেও পরবর্তী কালে বেশ বঝতে পারি মাত্র একটি শাড়ির জন্য ঘর ভাঙলো এক অভাগীর। চুরি না করেও চোরের অপবাদ সহ্য করতে পারেনি সে। ফলে তার আর হলো সতীনের সংসার করা।

সে যে শাড়িটা চুরি করেনি তার প্রমাণ পেলাম। সামনে কুরবানি ঈদ। আমার জেঠামশাই কিনে এনেছিলেন একটি গাই গরু। সেটিকে বেধে রাখা হতো গাছ তলায় ঠিক যেখানটায় তারা কাপড়–চোপড় শুকাতো। অবশেষে এলো ঈদ। যথানিয়মে গরুটিকে করা হলো কুরবানি এবং বিস্ময়কর ব্যাপার যে, সেই গরুর পেট থেকেই পাওয়া গেল একটি শাড়ি। আমার মনে হলো, এটিই সেই শাড়ি যার জন্য ঘর ভেঙ্গেছিল সখিনার।

পোস্ট অফিস পাড়া, পাচবিবি থেকে

পুরস্কার

– মোশারফ হোসেন লিটন

১৯৯৬ সাল। তখন ক্লাস নাইনে উঠেছি। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়কার কথা। আমাদের ভাষাণটেক স্কুলে ফাইনাল খেলা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। আমাদের ক্লাসের অনেক ছাত্রই খেলায় অংশ নিয়েছে। কিন্তু আমরা কয়েকজন তা থেকে বাদ গেলাম। কিন্তু পরে অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলাম যেমন খুশি তেমন সাজবো। তাই আমার সঙ্গে মোর্শেদ ও স্বপনকে নিলাম। তবে কি সাজবো ভাবতে ভাবতে মূর্তির কথা মনে পড়লো। আমরা এর আগে দেখেছি প্রতি বছর একটা ছেলে গায়ে কাদা মাটি লেপটে মূর্তি সেজে পুরস্কার জিতে নেয়। তাই আমরা তিনজনে পণ করলাম এবার পুরস্কার আমরা নেবো তা যতো কষ্টই হোক। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির কলাভবনের সামনের অপরাজেয় বাংলা আমরা তিনজনে মিলে সাজবো।

এবার প্রস্তুতির পালা। লটারি করায় দুর্ভাগ্যবশত নারীর চরিত্রটি আমার কপালে পড়ে। যাহোক, আগামীকাল অনুষ্ঠান। তাই যে যার পোশাক সংগ্রহে মহা ব্যস্ত। কিন্তু শাড়ি পাবো কোথায়? আমি তো থাকি নানাবাড়ি।

শাড়ি চাইলে নানি দেবেন আছাড়। যদিও আমাকে মামি অনেক আদর করেন তবুও আমার ধারণা ছিল তিনি শাড়ি দেবেন না। তাই অনেক রাতে তার রুমে ঢুকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে একটা শাড়ি কাপড় নিয়ে এলাম।

পরদিন সকালে স্কুলে গিয়ে রেডি হতে লাগলাম। সহপাঠীরা আমাদের তিজনকে পোশাক পরিয়ে চার বালতি কাদামাটি মেখে একটি টেবিলে দাড় করিয়ে দিল। আর যথাসময়ে টেবিল শুদ্ধ নিয়ে মাঠের মাঝখানে দাড় করিয়ে দিল। এমন অবস্থায় এক ঘণ্টা দাড়িয়ে থেকে যখন নেমে যে যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছি তখন বন্ধু–বান্ধব এবং সহপাঠীরা টানা হেচড়ার এক পর্যায় আমার পরনের শাড়ি চার টুকরো রুমালে পরিণত হলো। বাসায় গিয়ে কেউ কিছু বোঝার আগেই গোসলখানায় শাড়ির টুকরো রেখে গোসল সেরে স্কুলে আসি।

কিছুক্ষণ পর পুরস্কার বিতরণ হলো। আমরা তাতে প্রথম হই। পুরস্কার নিয়ে যখন বাসায় এলাম তখন আমাকে বকাবকি এবং চপেটাঘাত আরম্ভ করলেন মামি। তখন পুরস্কারটা তার হাতে দিয়ে সব খুলে বললাম। তিনি তখন আমার মায়ের মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেললেন।

আর বললেন, বোকা ছেলে, তুই যদি আমার আগে বলতি তাহলে কি শাড়ি দিতাম না? না হয় পুরনোটাই দিতাম। তাই বলে তুই আমায় না বলে নতুন শাড়িটা নিয়ে যাবি!

মামির কান্না দেখে সেদিন আমিও কেদেছিলাম। কিন্তু গর্ববোধও হয়েছিল পুরস্কার এবং আমার প্রতি মামির মমত্ববোধ দেখে। সেই থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, জীবনের প্রথম রোজগারের পয়সা দিয়ে মামিকে শাড়ি কিনে দেবো।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে

অনুভব

– অঞ্জু

এক দুঃখিনী মেয়ে আমি। বাবা নিরুদ্দেশ। পৈতৃক ভিটাতে জ্ঞাতিদের অত্যাচার সহ্য করে এবং এনজিওদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মা জীবন ধারণের রসদ সংগ্রহ করেন। পড়াশোনার আগ্রহ দেখে মা স্কুলে দিলেন। স্কুলের সামান্য খরচও বহন করা তার পক্ষে কষ্টকর। যখন ক্লাস এইটে উঠলাম তখন বই কেনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। মনে হলো পড়াশোনা বোধহয় বন্ধ হয়ে যাবে। রাতে একা কাদলাম।

কিছুদিন আগে জ্ঞাতিদের সঙ্গে জমির বিষয়ে এক সমস্যা নিয়ে উপজেলার প্রধান কর্মকর্তার কাছে পর্যন্ত গিয়েছিল। তিনি মিটিয়ে দিয়েছিলেন। মা বললেন, চল সেই স্যারের কাছে যাই।

একদিন মায়ের সঙ্গে গেলাম উপজেলার সেই বড় কর্মকর্তার অফিসে। ভেবেছিলাম বড় অফিসার দেখা করতেই লেগে যাবে কয়েক ঘণ্টা। হয়তো কথাই বলবেন না। দেখলাম তা নয়। মায়ের পেছনে পেছনে লজ্জা এবং ভয় দুটোর ভারে মাথা নিচু করে প্রবেশ করলাম তার ঘরে।

তিনি অন্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বসতে বললেন।

মা সমস্যার কথা বললেন।

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম তোমার।

চোখ তুলে তাকালাম বড় অফিসারের দিকে। আমার ভয়, লজ্জা সব দূর হয়ে গেল। কি প্রশান্ত চাহনি, কি আন্তরিক জিজ্ঞাসা। আমার কচি বুক কেন জানি আলোড়িত হলো। তিনি বুক লিস্ট চেয়ে নিয়ে দুই তিন দিন পরে যেতে বললেন। ফেরার সময় পেছন ফিরে তাকালাম। দেখি তিনি কাজে ডুবে গেছেন।

কয়েকদিন পরে একাই গেলাম। আমার বইগুলো প্যাকেট করে বাধা। তিনি হেসে উঠে নিয়ে যেতে বললেন। ভেবেছিলাম একটু বসবো। সে সুযোগ হলো না। মন দিয়ে লেখাপড়া করতে বললেন। নতুন বই পাবার আনন্দের চেয়ে কি যেন এক আনন্দ ঘিরে রইলো সারাটা সময়।

প্রায়ই ইচ্ছা হতো তার কাছে যেতে। কি এক টান সব সময় আমাকে তার কাছে টানতো। সপ্তাহ দুই পরে আর থাকতে না পেরে কোনো কারণ ছাড়াই আবার গেলাম। তিনি অনেক লোক নিয়ে কথা বলছিলেন। বাইরে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। অনেকবার মনে হলো চলে যাই। যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এসেছি তাহলে কি উত্তর দেবো? কিন্তু যেতে পারিনি। এক সময় ঘর খালি হলে প্রবেশ করলাম। দেখলাম আমার নাম তার মনে আছে। জড়সড়ো হয়ে বসলাম। ঘরে আর কেউ নেই।

তিনি কাজ করার ফাকে কথা বলছিলেন।

আমি হু, হ্যা করে উত্তর দিলাম। কাটলো কিছু সময়। আমি উঠতে চাইলাম।

বললেন, কেন এসেছিলে বললে না তো।

তার সহজ সরল ব্যবহারে আমার সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গিয়েছিল। তাই হঠাৎ করেই বলে ফেললাম, এমনিই।

তিনি হেসে বললেন, তাই? আবার এসো।

এক বুক ভালোলাগা নিয়ে ফিরে এলাম। সারাক্ষণ কি এক ভালোলাগা ঘিরে থাকলো। যা দেখি তাই–ই ভালো লাগে। এরই নাম কি ভালোবাসা? আমার কচি বুকে কি ভালোবাসা জন্মালো! কিন্তু কার সঙ্গে। এ যে শুধু অসম্ভব নয় এর চেয়েও বড়। সব বুঝেও তার কাছে যাওয়া বন্ধ করতে পারলাম না। দুই এক সপ্তাহ পরেই কারণে অকারণে বা সামান্য কারণেই যাই। সব সময় তাকে পাওয়া যায় না। তাকে না পেয়ে বা কথা বলার সুযোগ না পেয়ে অনেকবার ফিরে এসেছি। এরপরও মনটা ভালো লাগতো। বুঝতে পারছিলাম যে, আমি মরেছি।

কেটে গেল অনেক দিন। তার কাছে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছি। দুই একটা দুষ্টামির কথাও বলি। তিনি হাসেন। এর মধ্যে এলো দুর্গাপূজা। পূজার কয়েকদিন আগে যেদিন গেলাম কথা বলার সুযোগ পাইনি। হাতে একটা প্যাকেট দিলেন। বাড়ি এসে খুলে দেখি দুটো শাড়ি। এক সঙ্গে দুটো নতুন শাড়ি দেখে মা খুশিতে উজ্জ্বল। শাড়িটি বুকে জড়িয়ে রাখলাম অনেকক্ষণ।

জানতাম তিনি শুক্রবারেও অফিসের কাজ করেন। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে পরের শুক্রবারে তার অফিসে হাজির হলাম। সারা অফিসে কোনো লোকজন নেই। শুধু দোতলায় তার ঘরের দরজা খোলা। চুপি চুপি তার ঘরে ঢুকলাম। তিনি আপন মনে কি যেন লিখছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে আমাকে দেখে অবাক হলেন।

বললেন, সুন্দর লাগছে তো।

লজ্জা পেলাম। এই প্রথম আমার শাড়ি পরে কোথাও আসা। তার দেয়া শাড়িটা পরে এসেছি। মনটা খুব করে চাইলো তাকে প্রণাম করি। একে তো নতুন শাড়ি, তার ওপর প্রথম শাড়ি পরেছি। সামলানো কষ্টকর। আড়ষ্ট পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, প্রণাম করবো।

তিনি চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এসে দাড়ালেন। কোনোমতে প্রণাম শেষ হতেই দুই হাতে আমাকে ধরে দাড় করালেন। এই প্রথম তার স্পর্শ পেলাম। আশ্চর্য চোখে তাকালেন আমার দিকে। সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারলাম না। চোখ নামালাম। দুই হাতে আমার মুখ তুলে ধরলেন। লজ্জায় চোখ বন্ধ করলাম। তার ঠোট আমার ঠোটের ওপর নেমে এলো। কেপে উঠলাম এক নতুন অনুভূতিতে। বোধ করি, কেপে উঠে তাকে জাপটে ধরেছিলাম। আমি তো আমার সব কিছু অনেক আগেই দিয়েছিলাম। তবু দ্বিধা ছিল। আজ তা ভেঙে গেল।

নতুন শাড়িটা খুলে নিলেন সযত্নে। মায়ের ঢোলা ব্লাউজটাও খুললেন অনায়াসে। বাধা দেয়ার কথা মনে হয়নি। এক নতুন পুলকে শিহরিত হচ্ছিলাম। এই প্রথম বুকের সৌন্দর্য নিয়ে উন্মোচিত হলাম একজন পুরুষের সামনে। তিনি হাত রাখলেন সদ্য স্ফীত হওয়া মাংসপিণ্ডে। আকারে ছোট মাংসপিণ্ড তার দুই মুঠিতে আবদ্ধ হলো সহজেই। তিনি আদরের ভঙ্গিতে চাপ দিলেন কিছুক্ষণ। এরপর হাত সরিয়ে সেখানে মুখ রাখলেন। প্রায় অর্ধেক মাংসপিণ্ড মুখের মধ্যে নিয়ে নিলেন। জিভ দিয়ে আদর

করলেন দুটোতেই। অবশ হয়ে দাড়িয়ে বার বার কেপে কেপে উঠছিলাম। মুখ দিয়ে বোধহয় দুই একটা শব্দ বের হয়েছিল। তবে তা ব্যথার, না আনন্দের জানি না।

তিনি আর এগোলেন না। খোলা পিঠে পরম আদরে হাত বুলালেন, ঘাড়ে চুমু দিলেন। স্তন দুটিকে আবারও মৃদু পিষ্ট করে আদর করে আমাকে ছেড়ে দিলেন।

এই হলো আমার প্রথম শাড়ি পাবার এবং পরার ঘটনা।

এরপর আরো দুই চারবার তিনি আমার বুকের সম্পদ দুটি পিষ্ট করেছেন, আদর করেছেন, খেলা করেছেন। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। তিনি বদলি হয়ে গেছেন। যোগাযোগ নেই। এখন তাকে বড় বেশি মনে পড়ে। আবার যদি দেখা হতো?

এখন শাড়ি পরি। কিন্তু সেই প্রথম শাড়ি পরার কথা ভুলতে পারি না। সেদিনের কথা ভাবলেই শরীর অবশ হয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে সুখ অনুভব করি।

তজুমদ্দিন, ভোলা থেকে

থ্রি স্টার পুলিশ

– মোহাম্মদ রুহুল আমিন

আমার চাকরি জীবনের শুরু ১৯৮৮–তে ভৈরববাজারে একটি বেসরকারি ব্যাংকে। সপ্তাহ পর পর বাড়িতে যেতাম। যে সপ্তাহে বাড়ি যেতে পারতাম না অর্থাৎ শুক্রবার সেদিন আমরা কয়েকজন মিলে ভৈরব রেল স্টেশন ঘুরতে যেতাম। উচু রেল লাইন দিয়ে হাটতাম আর মুক্ত বাতাস গিলতাম। আবার কোথাও বসে বসে নানান গল্প করতাম। নতুন জায়গা। তাই সব কিছু চেনা–জানা না থাকায় রেল লাইনেই বসে থাকতাম এবং চলন্ত ট্রেনের বগি গুণতাম। ভৈরব স্টেশনে যখন ট্রেন থামতো তখন বিভিন্ন যাত্রীদের মাঝে গরিব শ্রেণীর কিছু যাত্রীও নামতো। হাতে পলিথিনের ব্যাগ ভর্তি চিনি নিয়ে এবং কেউ কেউ তিন চারটি ইনডিয়ান শাড়ি গায়ের সঙ্গে পেচিয়ে নিয়ে আসতো ও এখানেই নামতো। মাঝে মধ্যে দেখতাম কিছু পুরুষ লোক সেই মহিলাদের আচল ধরে টানছে। তখন আমরা এখানে নতুন বলে কিছু বুঝতাম না। মনে করতাম কোনো খারাপ মহিলা। তাই কেউ হয়তো তাদের অন্য কোথাও নেয়ার জন্য আচল ধরে টানছে।

এভাবে প্রায়ই দেখতাম। তাই একদিন কৌতূহল নিবারণের জন্য স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন সে বললো, তারা ইনডিয়ান শাড়ি আনছে। ভাসমান ক্রেতা সেই কাপড় পছন্দ হলেই মহিলার আচল ধরে টানছে কাপড়টি খুলে দেয়ার জন্য। দরদাম ঠিক হলে সেই মহিলা তার গায়ের শাড়িটি ক্রেতাকে খুলে দেয়।

১৯৯০। আমার চাকরি বয়স দুই বছর। ওই বছর আগস্ট মাসে বিয়ের সুবাদে প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যেতে হয়। বিয়ের কয়েক মাস পর আসছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। তখন আমার স্ত্রী একদিন বললো, ভৈরবে নাকি সুন্দর সুন্দর ইনডিয়ান শাড়ি পাওয়া যায়। আমার জন্য দুইটা শাড়ি নিয়ে এসো।

আমি স্ত্রীর সোহাগ পেতে ঈদের দুই দিন আগে রেল স্টেশনে গিয়ে পছন্দ মতো দুটি শাড়ি কিনে মেসে নিয়ে এলাম। শাড়ি দুটিকে ব্যাংকের বড় খামে ভর্তি করে লাল সুতা দিয়ে বেধে রাখলাম। তারপর অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি পাটের ব্যাগের নিচে শাড়ি দুটি রেখে অন্য জিনিসগুলো ওপর রেখে ব্যাগটির চেইন লাগিয়ে দিই।

যেহেতু ভৈরব থেকে ঢাকা আসতে ঈদের আগে বিভিন্ন স্থানে চেক পোস্ট বানিয়ে গাড়ি চেক করে। পুলিশ যাতে ধরতে না পারে তার জন্য শাড়ি দুটি ওইভাবে যত্ন করে ব্যাগের মধ্যে রেখেছি।

ঈদের আগের দিন ভোরের বাসে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। ভৈরব থেকে ছাড়ার পর নারায়ণপুর স্থানে এলে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে চেক শুরু করলো। পাচ ছয়টি ব্যাগ চেক করে গাড়ি ছেড়ে দিল। তারপর গাড়িটি মাধবদী পৌছার পর সেখানেও পুলিশ গাড়ি থামালো।

এখানে দুই তিনটি পুলিশ গাড়ির ভেতর উকি মেরে দুই একটি ব্যাগ চেক করে বললো, ওস্তাদ, কিছুই নেই।

আবার গাড়ি ছাড়লো। এবার গাড়ি থামলো তারাবো নামে স্থানে। এখানে দেখি আমার গাড়ির সামনে সার্জেন্টের গাড়ি। তখন আমার অবস্থা খারাপ। মনে মনে ভাবলাম ঘাটে এসে বুঝি তীর ডুবলো। যেই ভাবা সেই কাজ। হাত পা কাপছে।

এবার গাড়িতে উঠলো থৃ স্টার একজন সার্জেন্ট ও একজন সেপাই। সবার ব্যাগ চেক করার পর এবার আমার পালা। সার্জেন্ট আমার কাছে এসে বললেন, ব্যাগে কি আছে?

বললাম, সামান্য জিনিপত্র।

তিনি বললেন, ব্যাগ খুলুন।

আমি আস্তে আস্তে উপরের জিনিসগুলো ব্যাগ থেকে বের করে শাড়ি দুইটি ব্যাগের ভেতর রেখেই বললাম, আর কিছু নেই।

তখন তিনি নিজ হাতেই আমার সাধের শাড়ির খামটি খুলে দেখেন দুটি ইনডিয়ান শাড়ি। তখন বলে, এটা কি শালা?

আমার আত্মারাম শুকিয়ে কাঠ। বললাম, ঈদের সময় নতুন স্ত্রীর জন্য কিনেছি, ছেড়ে দিন।

সে চোখ দুটি বড় বড় করে বললো, শালা, তোকে এখন শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবো।

এ কথা শুনে আমার হাত পা কাপতে শুরু হয়েছে। তখন অন্য দুই একজন যাত্রী বললেন, স্যার, আমাদের গাড়িতে অবৈধ কোনো মাল পাননি। এই ভদ্রলোকটির শাড়ি দুটি দিয়ে দিন।

এ কথা শুনে সার্জেন্ট বললেন, এখন আমার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গেলে সেখানেই দিতে পারবো।

এ কথা বলে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বলে, এখন শ্বশুরবাড়ি যাবি, না নিজের বাড়ি যাবি?

বললাম, আর কোনোদিন আনবো না, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার।

আর কোনো কথা শুনতে চাই না, থানায় চল।

তখন অন্য একজন সেপাই এসে বললো, স্যার, শাড়ি দুটি রেখে দিয়ে তাকে ছেড়ে দিন।

তখন আমি একটু সাহস করে বললাম, স্যার, শাড়ি দুটি দিয়ে দিন আর কোনোদিন আনবো না।

সে বললো, ঝামেলা না করে বাড়ি চলে যাও, না হলে শ্রীঘরে যেতে হবে।

এ কথা বলার পর সার্জেন্ট আমার শাড়ি দুটি তার গাড়ির পেছনে রেখে আমাদের গাড়ি গন্তব্যে যাওয়ার নির্দেশ দিলো।

আমি গাড়িতে উঠে গাড়ির পেছন দিয়ে সেই সার্জেন্টের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। গাড়ি ছুটে এলো। বাড়ি চলে এলাম। কিন্তু আমার প্রিয় স্ত্রীকে তার পছন্দের শাড়ি দিতে না পারায় মনটা আজো কেদে ওঠে।

বেতকা, মুন্সিগঞ্জ থেকে

উপহার

–এসএম সালাহউদ্দীন

আমি ১৯৯৮ সালে ফার্স্ট ডিভিশনে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করে পাবনা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দিই। ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি এমন সময় আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারলাম ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকায় যারা পঞ্চশ জনের মধ্যে থাকবে তাদের প্রত্যেককে কলেজ থেকে নয় শত পাচ টাকা করে বৃত্তি দেবে।

এর কিছুদিন পর যখন ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো তখন দেখি আমি মেধা তালিকায় ১৯ নাম্বারে আছি। বৃত্তির কথা ভাবতেই প্রথমে আমার মেজভাবীর কথা মনে পড়লো। সুখে–দুঃখে, বিপদে–আপদে এবং আমার দুঃসময়ে এই মেজভাবীই পাশে এসে দাড়িয়েছেন। আমার যতো আবদার, যতো অভিযোগ সবই প্রাণপ্রিয় মেজভাবীর কাছে। কখনো মেজভাইয়ের কাছে নয়, আম্মার কাছেও নয়।

মেজভাইকে আমরা সব ভাই–ই খুব ভয় করি। ধমক তো দূরের কথা, মেজভাই আমাদের সঙ্গে কখনো জোরে কথা বলেননি। কোনো অপরাধ করলে মেজভাবীই সব সামলিয়ে নেন। এই ভাবীই আমাকে লেখাপড়ায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মেজভাবীকে উপলব্ধি করি।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর যখন বৃত্তির টাকা হাতে পেলাম তখন টাকাগুলো আম্মার হাতে দিয়ে বললাম, এই টাকা দিয়ে মেজভাবীকে একটি শাড়ি, মেজভাইকে একটি লুঙ্গি আর আপনি একটি শাড়ি কিনে নেবেন।

আমার কিনে দেয়া শাড়ি জানতে পেরে মনে হলো, ভাবী আকাশের চাদ হাতে পেয়েছেন। ভাবীর খুশি দেখে কতোটা আনন্দ পেয়েছিলাম তা লিখে জানানো সম্ভব না। এরপর দেখেছি ঈদের দিন, শুক্রবার এমনি কিছু শুভদিনে ভাবী শাড়িটি পরে। শাড়িটি পরলে ভাবীকে যেন অন্য দিনের চেয়ে বেশি সুন্দর মনে হয়। বিশেষ করে ভাবীর হাস্যোজ্জ্বল মুখটি দেখে অভিভূত হই। আর ভাবী সবাইকে গর্ব করে বলেন, এই শাড়িটি আমাকে আমার ছোট দেবর দিয়েছে।

কেউ কোনো উপহার পেলে এতোটা খুশি হয় তা এর আগে আমার জানা ছিল না। কাউকে কিছু উপহার দিয়ে যে এতোটা সুখ পাওয়া যায় এই প্রথম বুঝতে পারলাম। তিন বছর সাড়ে তিন বছরের পুরনো শাড়িটি ভাবী আজো পরম যত্নে তার দামি দামি শাড়ির মাঝে স্মৃতি করে রেখে দিয়েছেন।

আটুয়া, বাজিতপুর থেকে

কাঞ্জিভরম

–মণিকা

১৯৭৭। মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়ি। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ঘোষণা দিলেন, দেশের কিছু প্রাচীন কলেজকে সরকারিকরণ করা হবে। এই ঘোষণার আওতায় পড়ে গেল আমার বাবার কর্মস্থল বাগেরহাটের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজটি। সবাই মহা খুশি। কারণ সরকারি হয়ে গেলে সব অধ্যাপক, কর্মচারীসহ সকলেরই সরকারি আয়ের পথ খোলা হয়ে যায়। গভর্নিং বডির তত্ত্বাবধানে, তাদের মনমতো আর চলতে হবে না। কিন্তু সরকারি ঘোষণা যে বাস্তবায়িত হতে কতো সময় লাগবে তা কেউ জানে না। খুব সম্ভব এ সম্পর্কে কারো কোনো ধারণাও ছিল না। এমন যখন পরিস্থিতি, গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত হলো, সরকারি পদক্ষেপ না জানা পর্যন্ত কলেজের সব শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতন বন্ধ রাখা হবে। আমরা পড়লাম মহা সঙ্কটে। মাসকাবারি বেতনে যাদের সংসার চলে তাদের জন্য বেতন বন্ধ থাকা মানেই সংসারের চাকা বন্ধ হয়ে যাওয়া।

এমনিভাবে গেল তিন মাস। এর মাঝে বাবার জমানো যে যৎসামান্য টাকা ব্যাংকে ছিল শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো ধার–দেনা আর দোকানে বাকি পড়া। বাবার কিছু পুরনো ছাত্র ছিলেন। যারা ছিলেন ব্যবসায়ী এবং তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। তারা উদারভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। মাসের পর মাস বাকিতে চাল, ডাল, আটার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দিতে তারা মোটেই দ্বিধা করেননি। কাজেই খাদ্যাভাবে পড়িনি।

পড়লাম আরেকটি মৌলিক অভাবে। বস্ত্রাভাব কাকে বলে সেটা ওই বয়সে নিজেরা ঠিক ভালোভাবে না বুঝতে পারলেও বাবা–মা বুঝলেন হাড়ে হাড়ে। চোখের সামনে দেখতে পেলাম বাবার লুঙ্গিগুলো ছিড়ে যাচ্ছে, কেনা হচ্ছে না সময় মতো। মা তার যে কয়েকটা তোলা শাড়ি ছিল সেগুলো বাসায় এবং ঘরে পড়ার শাড়ি হিসেবে পড়া শুরু করলেন। একটা বেসরকারি কলেজের অধ্যাপকের স্ত্রীর কয়টা শাড়িই বা থাকতে পারে!

দেখতে দেখতে আরো দুই মাস কাটলো ওই একই অবস্থায়। ঢাকা থেকে কোনো খবর আসে না কলেজের ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্পর্কে। মায়ের আলমারিতে শাড়ির সংখ্যা এসে দাড়ালো প্রায় শূন্যে। কিছু তাতের শাড়ি আবার আমার বাবার লুঙ্গি হিসেবেও ব্যবহৃত হতে লাগলো।

এরই মাঝে এলো রোজার ঈদ। ঈদ মানেই নতুন কাপড় এই বোধ ছিল না আমার ছোটভাইদের, ছিল শুধু আমার। ঈদে নতুন কাপড় পরবো না, এটা ভাবতেই পারতাম না। এবার যে পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ছিল না। দিনরাত বায়না আর কান্নাকাটি করতে

লাগলাম মায়ের কাছে। মা কতোভাবে যে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আমি কিছুটা বুঝলেও না বোঝার ভান করে বায়না করতেই লাগলাম। প্রতিবেশী বন্ধুদের উদাহরণ টেনে প্রতিদিন মায়ের কাছে ঘ্যান ঘ্যান চলতেই লাগলো।

আমার বিরক্তি আর সহ্য করতে না পেরে আমার সর্বংসহা মা তার অবশিষ্ট খুব যত্ন করে তুলে রাখা *কাঞ্জিভরম* শাড়িটি নামালেন। ওই শাড়িটি কেটে মা নিজের হাতে তৈরি করে দিলেন অতি সুন্দর, সব বন্ধুদের চেয়ে অন্য রকম একটি ফ্রক। ঈদের দিন সকালে অতি উৎসাহে ওই ফ্রকটি যখন পরলাম, মা হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অবুঝ আমি খুশি মনে বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে গেলাম। একবারও মায়ের ভেতরের কান্নাটা বুঝতে পারলাম না।

ওই কাঞ্জিভরম শাড়ি ছিল মায়ের কুমারী জীবনের একটি নিদর্শন। এতো বেশি প্রিয় ছিল শাড়িটি যে আমার মা কালেভদ্রে কোনো বিয়ের নিমন্ত্রণ বা ওই ধরনের কোনো ফাংশন ছাড়া শাড়িটি পরতেন না। আর আমি অবুঝ হওয়াতেই মা তার এতো প্রিয় শাড়িটি নষ্ট করতে বাধ্য হয়েছেন।

এর কিছুদিন পরেই অতি প্রত্যাশিত সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হলো, কলেজ সরকারি হলো, বাবা এক সঙ্গে পাচ মাসের বেতন পেলেন। সব ঘটলো স্বপ্নের মতো একের পর এক। বাবা মায়ের জন্য এক সঙ্গে কয়েকটি তাত ও একটি জামদারি শাড়ি কিনে আনলেন। আমাদের সব কষ্ট দূর হয়ে গেল। ঘুচলো না মায়ের কাঞ্জিভরম শাড়ি হারানোর কষ্ট। তখন ইনডিয়ান শাড়ি তেমন একটা আসতো না। কাঞ্জিভরম শাড়ি তখন ছিল না বাজারে। এরপরে বাবা–মা অনেক খুজেছেন ঠিক ওই রকমটি আরেকটি শাড়ি। কিন্তু কখনই পাননি।

আমি যতো বড় হয়েছি, বুঝতে শিখেছি। ততোই মায়ের শাড়িটির জন্য কষ্ট পেয়েছি। এখন আমরা প্রতিটি ভাইবোন খুব ভালো বেতনের চাকরি করি। প্রতি ঈদ শুধু নয়, প্রায় প্রতি মাসেই মায়ের জন্য শাড়ি কিনি। এখন আমার মায়ের বিভিন্ন রকমের অনেক শাড়ি। নেই শুধু ওই রকম একটি কাঞ্জিভরম। হালকা বেগুনি রঙের কাঞ্জিভরম যে কতো খুজেছি আমি। কিন্তু পাইনি কোথাও। আমার মা কখনই তার কাঞ্জিভরমের দুঃখ ভুলতে পারেননি। সেই সঙ্গে আমিও সারাক্ষণ অপরাধ বোধে ভুগি এখনো।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

মিলার মতো

–সামিমা

আমার শাড়ি অন্যকে পরতে দেয়ার ব্যাপারে আমি বড়ই অনুদার। অথচ অন্য কিছু কেউ চাইলে কখনোই না করি না যদি সেটা আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে। সহজাত প্রবৃত্তিবশে একটি মেয়ে শিশু কিছু বুঝতে শুরু করার পর পরই তার শাড়ির প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এর ব্যতিক্রম আমিও ছিলাম না। মনে পড়ে, খুব ছোটবেলায় আমার বড়বোন কোনো নতুন ওড়না কিনলে কিংবা বাড়িতে নতুন বড় গামছা কেনা হলে তা নিয়ে আমার কয়েকদিন শাড়ি পরার গবেষণা চলতো। ফ্রকটা বুকের কাছে

গুটিয়ে নিয়ে ব্লাউজ এবং ওড়না বা গামছা হাফ প্যান্টের কোমরে গুজে দিয়ে শাড়ি পরতাম। এভাবে শৈশব পার করেছি।

কৈশোরে আমার বন্ধু ছিল প্রতিবেশী তিন বোন। আমরা প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষা শেষে পিকনিক করতাম। শেষবার ক্লাস নাইনে আমরা চারজন পিকনিক শেষে শাড়ি পরে স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তুলেছিলাম যা আজো স্মৃতি হিসেবে অ্যালবামে আছে। কলেজে থাকা অবস্থায় মায়ের জন্য নতুন শাড়ি কেনা হলেই আমি তা পরে উদ্বোধন করতাম। আমার বড়বোন আমাকে প্রতি বছর কোরবানি ঈদে শাড়ি উপহার দেন এবং বলেন, তুই এতো শাড়ি দিয়ে কি করবি? আমার উত্তরটা হয় ভবিষ্যৎ বর–এর খরচ কমাচ্ছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির হলে থাকাকালে আমার রুমে বিশেষ দিনগুলোতে যেমন ইংরেজি নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ, ভ্যালেনটাইনস ডে, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৬ ডিসেম্বর এবং পহেলা ফাল্গুনে পার্শ্ববর্তী রুমের মেয়েদের অত্যাচার বেড়ে যেতো। কারণ আমার রুমমেট, সে আমারই ক্লাসমেট খুব ভালো শাড়ি পরাতে পারতো। সে না থাকলে আমাদের ওপর অত্যাচার চলতো। ক্লাস এইটে ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পাবার পর প্রথম শাড়ি উপহার দিই আমার মা এবং বোনকে। এরপর ভাবীকে তাদের প্রথম বিয়েবার্ষিকীতে এবং আমার ভাগ্নির তিন বছর বয়সের জন্মদিনে আমিই প্রথম তাকে শাড়ি উপহার দিই। শাড়ি পরলে প্রত্যেকটি মেয়েকেই কেন জানি খুব সুন্দর লাগে। শাড়ি একটি খোলামেলা পোশাক হওয়ায় শাড়ির তুলনায় সালোয়ার–কামিজে বেশি স্বস্তি বোধ করি যদিও লোকমুখে শুনি শাড়িতে আমাকে সুন্দর লাগে।

তবে আমার কাছে একটি নারীকে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় খুবই আকর্ষণীয় মনে হয় যদিও তার সামনের অংশটুকু আজও দেখতে পাইনি। সেই নারী হচ্ছে মিলা। আমারই লোভ হয় যেন দুই হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরি। মাঝে মধ্যে চিন্তা করি কেন মইন–মিলার বিয়ে হলো না। আবার পরক্ষণই ভাবি, তারা দুজন পৃথকভাবে বসবাস করে বলেই আমাদের দেশপ্রেমিক ভণ্ড রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের কথা আমরা জানতে পারি। এছাড়া দেশ–বিদেশের অনেক তথ্যের পাশাপাশি মইনের অনেক জোকসও জানতে পারি যা পরবর্তী কালে বন্ধু মহলে সাপ্লাই দিই। সবশেষে আমার ইচ্ছা করে, একদিন মিলার মতো শাড়ি পরে দাড়িয়ে থাকবো এবং আমার বর কোমর জড়িয়ে ধরবে।

তালতলা, আগারগাও থেকে

মিলিটারি ডেইরি ফার্ম

– নাছরিন সুলতানা রেখা

প্রতিবছর হেড অফিস থেকে পিকনিকের জন্য টাকা দেয়া হয়। অফিস স্টাফদের মধ্যে ছেলের সংখ্যা কম থাকায় এতো সব আয়োজনের সমস্যার জন্য যাওয়া হয় না। টাকাটা দিয়ে চায়নিজ অথবা ভালো কিছু খেয়ে নিই। এবার সবারই ইচ্ছা পিকনিকে যাবোই।

যথারীতি পিকনিকের দিন, তারিখ ও স্পট ঠিক করা হলো। আট ফেব্রুয়ারি ২০০২–এ পিকনিক। স্পট ঠিক করা হলো সাভারের মিলিটারি ডেইরি ফার্ম এলাকায়। মন আনন্দে নেচে উঠলো এ ভেবে যে, সবাই মিলে এই দিনটা খুব উপভোগ করা যাবে। আর পিকনিক মানেই আনন্দ করা, সাজগোজ করা ইত্যাদি। এবার শুরু হলো কেনাকাটার পালা। নতুন শাড়ি, জুতা, ব্যাগ, কসমেটিক ও গহনা ইত্যাদি। হাতে সময় কম। এতো সব কবে কিনবো! শেষ পর্যন্ত শাড়ি ছাড়া সব কেনা হলো। সব মার্কেট ঘুরে কোথাও শাড়ি পছন্দ হলো না। তখন বাণিজ্য মেলা চলছে। কাকিকে সঙ্গে নিয়ে বাণিজ্য মেলায় গেলাম শাড়ি কিনতে। রাজশাহী সিল্ক স্টলে একটি শাড়ি কাকি ও আমার দুজনেরই খুব পছন্দ হলো এবং কেনাও হলো। কেনাকাটার পালা শেষ। এবার অপেক্ষা করতে থাকলাম কাঙ্ক্ষিত দিনটির জন্য।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত দিনটি ঘনিয়ে এলো। আগামীকাল পিকনিক। আনন্দে সারা রাত ঘুম হলো না। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। কারণ সাড়ে আটটার মধ্যে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। গেস্ট হিসেবে আমার সঙ্গে যাবে আমার ছোট বোন কচি। ভোর থেকেই দুই বোন সেজে গুজে তৈরি হতে থাকলাম। পিকনিক উপলক্ষে কেনা নতুন শাড়িটা পরে নিলাম। বারবার ড্রেসিং টেবিলে নিজেকে দেখে নিচ্ছিলাম সব ঠিকঠাক আছে কি না। এবং শাড়িটা ভালো ম্যানিয়েছে কি না ইত্যাদি। নতুন শাড়ি, জুতা, গহনা, পিকনিক সব মিলে মনের ভেতর বেশ পুলকিত হচ্ছিল। অবশেষে ঠিক আটটার মধ্যে বাসা থেকে বের হয়ে রিকশা নিয়ে মিরপুর টেকনিকাল মোড়ে এসে পৌছালাম।

এবার গাড়ির জন্য অপেক্ষার পালা। সায়দাবাদ থেকে শুরু করে সবাইকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে আসতে গাড়ি এসে পৌছালো ঠিক সাড়ে নয়টায় অর্থাৎ আমার ঠিক এক ঘণ্টা পর। হঠাৎ গাড়ি দেখে মহাআনন্দে লাফিয়ে উঠলাম এবং এক লাফে গাড়িতে উঠে সবাইকে এক নজর দেখে নিলাম। সবার শেষে গাড়িতে ওঠায় বসার জন্য ভালো সিট পাইনি। তবুও মনের আনন্দের শেষ নেই।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত পিকনিক স্পটে এসে পৌছালাম। গাড়ি থেকে নেমে সবার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম এবং অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হলাম। পরিচিতি পর্ব শেষে আমরা সকালের নাশতা খেয়ে সবার সঙ্গে গল্পে মেতে উঠলাম। খুব হাসাহাসি করতে লাগলাম। হঠাৎ মাইক্রোফোনে জানিয়ে দেয়া হলো যে, নাশতা সেরে আমরা ডেইরি ফার্ম এলাকাটা ঘুরে দেখবো এবং এখানে একটা মিনি চিড়িয়াখানা আছে সেখানে যাবো।

নাশতা সেরে আমরা মিনি চিড়িয়াখানার উদ্দেশে রওনা হলাম। কে জানতো সেখানেই আমার সব আনন্দ নিমেষেই শেষ হয়ে যাবে। সরু রাস্তার দুই পাশে সারিবাধা শাল গাছ এবং বিভিন্ন রকমের সবুজ গাছ ও ঘাস যেন সবুজ রঙের বিছানা। শীতের সোনালি রোদ, শাড়ি পরে হেলেদুলে হাটতে বেশ ভালোই লাগছিল। বিভিন্ন আকা–বাকা ও উচু–নিচু রাস্তা পেরিয়ে আমরা মিনি চিড়িয়াখানার গেটে এসে পৌছালাম এবং টিকেট নিয়ে দল বেধে সবাই ভেতরে ঢুকে পরলাম। হরিণ, অজগর, জিরাফ ও বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখে শেষমেষ বানরের খাচার কাছে এসে দাড়ালাম।

আমার ডান পাশে নিলিমা ও কচি দড়িয়ে আছে। খাচার ভেতর পাচ ছয়টা বানর বেশ নাচানাচি করতে ছিল। হঠাৎ একটা বানর আমাদের সামনে এসে বসলো। এ সময় আমি এই বানর বলে দুই তিনবার ডাকলাম। এবং নীলিমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমার শাড়ির আচলে টান লাগলো। পেছন ফিরে দেখি শাড়ির আচলের পুরোটাই বানরের খাচার ভেতর। এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করতে লাগলাম আর শাড়ির আচল বাইরের দিকে টানতে লাগলাম। আমার সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠতে না পেরে যা দেখতে পেলাম তা হলো, বানর শাড়ির আচল আকড়ে ধরে দাত দিয়ে কেটে দুই হাতে ছিড়ে আচলের মাঝখান থেকে নিয়ে গেল। হতবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারলাম না।

এরই মধ্যে আমার চিৎকারে চারপাশের সব লোকজন এসে গেল। শাড়ির এই করুণ পরিণতি দেখে সবাই খুব আফসোস করতে লাগলো। এবং আমি তো ঘেমে অস্থির। নতুন শাড়ি, আজই প্রথম পরলাম। টাকাটার জন্যও বেশ কষ্ট লাগছিল। এতো কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল যখন দেখতে পেলাম আমার শাড়ির একাংশ বানর মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। এক পর্যায়ে নীলিমা তো সবাইকে বলেই বেড়ালো যে, আমি বানরকে বানর বলে বকা দিয়েছি। তাই বানর আমার শাড়ি ছিড়েছে। বাড়তি শাড়ি নিইনি বলে সেই শাড়িটাই সেফটিপিন দিয়ে এটে সারাদিন পরে থাকতে হয়েছে। বলতে গেলে সারাদিন আর আনন্দ করতে পারিনি বা কোনো উৎসাহ পাইনি এই ভেবে যে, ছেড়া একটা শাড়ি পরে আছি।

পরবর্তী এক ঘণ্টা আমরা চিড়িয়াখানায় বসে গল্প করছিলাম। এর মধ্যে বানর বেশ কয়েকজনকে আঘাত করেছে। আর একটা ছয় সাত বছরের শিশুকে তো চোখের নিচ থেকে বেশ খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে গেছে। এক ঘণ্টায় যা দেখতে পেলাম তাতে প্রতিদিন নিশ্চয়ই অনেকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত তো হবেই। একটা দুষ্ট প্রাণী বানরের খাচাটা এমনভাবে তৈরি যে, বানর সহজেই তার হাত ও পা বাইরে আনতে পারছে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

*সাভার মিলিটারি ডেইরি ফার্ম চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষকে আমরা অনুরোধ করছি তারা যেন বানরের খাচা বিষয়ে অতি দ্রুত আরো সতর্কতা অবলম্বন করেন –**যাযাদি***

কথা কয়

– শারমিন লিমা

সেদিন ডিউটি ডক্টর হিসেবে গাইনি ওয়ার্ডে কাজ করছি। আমরা তিনজন রোস্টারমেট। নাইট ডিউটি চলছিল। হঠাৎ নার্স খবর দিল, ওয়ার্ডে খুব খারাপ রোগী এসেছে, আপা তাড়াতাড়ি যান।

তিন বান্ধবী প্রায় ছুটতে ছুটতে ওয়ার্ডে পৌছালাম। কিন্তু রোগীকে সে রকম সিরিয়াস মনে হলো না। তবে পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়লো। তার পালস, ব্লাডপ্রেশার কোনোটাই রেকর্ড করা যাচ্ছে না।

আমার তো মাথা ঘুরে গেল। বাচ্চা হবার সময় অনেক রক্তপাত হয়েছে। এরপর থেকেই রোগী অন্য রকম আচরণ করছে। এ জন্য ভয় পেয়ে তারা হাসপাতালে এনেছে।

রাত যতোই বাড়তে লাগলো ততোই রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত হতে থাকলাম। তাড়াতাড়ি দুই দুটো চ্যানেল ওপেন করলাম (শিরায় স্যালাইন), ব্লাড ডিমান্ড দিয়ে দ্রুত রক্ত আনতে বললাম। রক্ত ছাড়া রোগীকে বাচানো যাবে না। বার বার বলা সত্ত্বেও তারা রক্ত যোগাড় করতে পারলো না। রোগীর রক্তের গ্রুপ ছিল *বি–নেগেটিভ।* আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালালাম। কিন্তু কখনো কখনো ডাক্তাররা বড় অসহায় হয়ে যায়। ঠিক এমন একটি মুহূর্তে আমাদের কিছুই করার ছিল না। রক্ত দিতে পারলে রোগী বেচে যেতো। আমরা তিনজন রোগীর কাছেই সারা রাত থাকলাম। ভোরের দিকে রোগীটি আস্তে করে নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। খুব কাছ থেকে দেখা এটাই আমার জীবনের প্রথম মৃত্যু।

রোগীটি ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। রোগীর মাকে দেখলাম, রোগীর পরনের শাড়িটি ছিড়ে বেডের একপাশে বেধে দিলেন। তখন তাদের ধর্মের কোনো প্রথা ভেবে কিছুই বলিনি। কিন্তু শাড়ির সেই ছেড়া টুকরোটাই আমার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ালো।

সেই মানুষটি হয়তো তাদের প্রথাগত কারণে ছাই–ভস্ম হয়ে গেছে। কিন্তু তার শাড়ির টুকরোটা ওয়ার্ডে ঢুকলেই আমাকে মনে করিয়ে দেয় একজন অবহেলিত নারীর কথা। বেচে থাকার জন্য তার আকুলতার কথা –

আপা আমাকে বাচান, আমি বাচতে চাই।

রাজশাহী থেকে

শাহজাহানের মা

– রব্বানী

গৃহশিক্ষকতার সূত্র ধরেই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সে ছিল ক্লাস সেভেনের ছাত্রী আর আমি এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। থাকতাম কলেজেরই এক হস্টেলে। পড়ানোর প্রথম বছরটা ভালোই কেটেছিল। সমস্যাটা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বছর থেকে। বাড়িতে ব্যাপারটা জানাতেই বাবার মুখে *তোর মুখ দেখতে চাইনে, তোকে ত্যাজ্যপুত্র করবো।* এই জাতীয় কথাবার্তা শুনতে হলো।

কিন্তু ছাত্রী নাছোড়াবান্দা। ফলাফল পালানো। তারপর বিয়ে। সহপাঠী, বন্ধুবান্ধবরা এতে যেমন অবাক হয়েছিল তেমন নিজেরাও কম হইনি। কোথা থেকে কি হয়ে গেল তখন বুঝতেই পারিনি।

শাওনের কাছে সময় চেয়েছিলাম। পাইনি। নাকচ করতে পারতাম। পারিনি কেবল অমোঘ ভালোবাসার জন্য। শেষ পর্যন্ত পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে বেকার অবস্থায় তাকে নিয়ে গ্রামে ফেরা। নিজ বাড়িতে ঠাই না পাওয়াতে উঠলাম গ্রাম থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরের এক দূরসম্পর্কীয় মামার বাড়িতে। এরপর মামাকে দিয়ে বাবাকে ব্যর্থ বোঝানোর চেষ্টা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, অগত্যা মামার বাড়িতেই যাপন।

কিছুদিন পর দুজনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখানেই থাকবো। মামার কাছ থেকে কিছু জমি লিজ নিয়েছিলাম। তারপর সেই জমিতে অসম্ভব পরিশ্রম করেছি। গ্রামেরই ছেলে, মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। কিন্তু শাওন ছিল ধনী পরিবারের একমাত্র কন্যা। এরপরও বাড়িতে প্রচুর পরিশ্রম করতো সে। এমন পরিশ্রম করেও প্রথম সাত আট মাস খুব কষ্টের মধ্যে ছিলাম আমরা। কোনো কোনোদিন চাল থাকতো না ঘরে। আবার চাল থাকলেও বাজার করার টাকা ছিল না। দুজনার ভালোবাসার কাছে এসব ছিল অতি নগণ্য।

এরপর ধীরে ধীরে কষ্ট কমতে থাকলো আমাদের। জমিতে ফসল পেতে শুরু করলাম। বাড়িতে তার তদারকে হাস-মুরগি ডিম দিতে শুরু করলো, খেয়ে-দেয়েও কিছু সঞ্চয় হতে লাগলো।

তার জীবনে একটাই ইচ্ছা ছিল, নিজেদের একটা বাড়ি আর বাগান করা। বাড়ির ঠিক দরজার কাছেই থাকবে তার সবচেয়ে প্রিয় ফুল হাসনাহেনা একদিকে আর আমার গন্ধরাজ অন্যদিকে।

এর মাঝে তিনটি বছর কেমন করে কেটে গেল জানি না। বাড়ি করার মতো সামর্থ আমাদের ছিল না। এটা উভয়েই জানতাম। এরপরও দুজনে ঠিকই প্ল্যান করতাম, ছবি আকতাম। ঘর তিনটে হবে, না চারটে, চারদিকে দেয়াল থাকবে কি না!

এর দুই বছর পর আমরা আশাবাদী হলাম, হয়তো একটা ছোট বাড়ি বানাতে পারবো। পরবর্তী চার বছরে আমরা বাড়িটা শেষ করতে পেরেছি। তার বাগানও হয়েছে। শাক-সবজি আর ফুলের গাছে ভরা। ছোট নয়, মোটামুটি বড় বাড়িই করেছি। তার প্রিয় হাসনাহেনার তিনটি চারা আজ ঝাউ গাছের মতো হয়েছে। আমার গন্ধরাজও ফুল ফোটাতে আরম্ভ করেছে।

গত বছর প্রথমবারের মতো মা হতে গিয়ে মারা গেছে সে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, করতে পারি না। বাড়ির সামনের বাগানেই তার কবর। সে যখন গর্ভবতী তখন ছেলে হবে, না মেয়ে হবে এ নিয়ে কতো কথা, কতো স্মৃতি। তার আশা ছিল প্রথম ছেলেই হবে এবং নাম রাখবে শাহজাহান। নিয়তির পরিহাস! ছেলেই হয়েছে, শাহজাহানই তার নাম রেখেছি।

এখন রাত প্রায় তিনটা, আমার পাশেই শুয়ে আছে ক্ষুদ্র সম্রাট। কিছুক্ষণ আগেই তার কাথা বদল করে দিয়েছি। প্রস্রাব করে রাতে অন্তত দুই তিনবার বিছানা ভেজায় সে।

শাওন মারা গেলে আমি কাদিনি। কাদতে পারিনি। কিন্তু এখন রোজ রাতে কান্না আসে। মনে পড়ে একবার তাকে একটি সিল্কের শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। শাড়িটি তার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। সে বলেছিল, আমাদের বাবু হলে এই শাড়িটি পরে বাবার কাছে গিয়ে কৃতকর্মের জন্য মাফ চেয়ে নেবো। কিন্তু আর হয়ে ওঠেনি। এখন শাড়িটির দিকে তাকালে কেমন জানি চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। পরক্ষণেই শব্দ করে কেদে ফেলি।

বাড়ি থেকে বাবা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তার কবর ছেড়ে যাইনি। শাওনের বাবা-মাও এসেছিলেন তার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে। সবাই ফিরে গেছেন। আমরা পিতা-পুত্র বড্ড নিঃসঙ্গ। আসলে শাওনের স্মৃতি ছাড়া যেমন আমার কিছু নেই তেমনি শাহজাহানও কোনোদিন জানবে না তার মা কেমন ছিল!

রাজশাহী থেকে

শখ

– আবদুর রাশেদ মোল্যা

নুন আনতে পান্তা ফুরায়, পান্তা আনতে নুন– এ কথাটির মর্ম আগে না বুঝলেও এখন ব্যাখ্যাসহ হাড়ে হাড়ে টের পাই। কিন্তু মানহানির ভয়ে এবং স্বল্প জ্ঞানের জন্য তা প্রকাশ করতে পারি না। তবে আজ সকল লাজ শরমের মাথা খেয়ে নিষ্ঠুর সত্যকে তুলে ধরছি, আমারই সংসারে ঘটে যাওয়া বাস্তব সত্য। আমার স্ত্রী হাসিকে খুশি করার ইতিহাস। খুশির বস্তু সোনা–দানা নয়। সামান্য একটা শাড়ি। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর বায়না ছিল একটা ভালো শাড়ি কেনার। কিন্তু আমি বেরসিক স্বামী আজো তার বায়না পূরণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। পারবোই বা কি করে? বেতনের সিংহভাগ টাকাই চলে যায় চালের দোকানে মাসের এক দুই তারিখে। পর্বতের মতো সারাটি মাস পড়ে থাকে সামনে। তারপর মাসের হাত খরচ, ভাইয়ের লেখাপড়া, বৌয়ের টুকিটাকি, নিজের পকেট খরচ, দৈনিক কাচা বাজার, রোগের চিকিৎসা ছাড়াও কতো না অনাকাঙ্ক্ষিত বাজেট নিজের অজান্তেই প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি হয়ে যায়। এসব করতেই চোখ বাধা ঘানির বলদের মতো ঘুরে বেড়াতে হয় নিজস্ব বৃত্তে। সময়ের মরিচা তলে আবদ্ধ থাকে হাসির বায়না। হাসি আমার দুরবস্থা কিছুটা বোঝে বলেই মাঝে মধ্যে ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ হলেও কোনো ফাটাফাটি হয় না। এমনি করেই কাটতে থাকে দিন, মাস, তারপর বছর।

বেচারি যেদিন টের পায়, আমার মতো *আমড়া কাঠের ঢেকি* দিয়ে আর যাই হোক, তার বায়না পূরণ হবে না সেদিন থেকেই সে বেছে নেয় বিকল্প পদ্ধতি। অর্থাৎ আমার পকেট গরম থাকতেই স্নেহের দান স্বরূপ দশ বিশ টাকা করে জমা করতে থাকে। এভাবে কাটে অনেক মাস। তার শখের বায়না পূরণের স্বপ্ন দেখে একদিন বলে, হ্যাগো, আমার কাছে যা জমেছে তা দিয়েই তোমার পছন্দসই একটা শাড়ি কিনে দাও না।

এ করুণ মিনতি শুনে নিজেকে সেদিন কি ভেবেছিলাম তা আজ খুলে বলতে পারবো না। তবে আমার চাকরি ও বেতন–ভাতাকে ধিক্কার দিয়েছিলাম যথেষ্ট। চাকরি পাওয়ার আগে আপনজনদের যে আশা–আকাঙ্ক্ষা ছিল তা সব কিছুর *গুড়ে বালি* হয়েছে চাকরি পাওয়ার পর। কারো আশা পূরণ করতে পারিনি। তাই কেউ বলে ভুলে গেছি, কারো ভাষায় বড়লোক হয়েছি আর কারো দৃষ্টিতে গোল্লায় গেছি। কাউকে বোঝাতে পারি না আমার আসল অবস্থা। মনে হয় আমার মতো ছাপোষা সকল চাকরিজীবীর একই অবস্থা। শুধু ভাবি, এমন চাকরিজীবীদের অবস্থার কি কোনোদিনই উন্নতি হবে না? যাহোক আসল কথায় ফিরে আসি। স্ত্রীর সঙ্গে এক রকম ওয়াদা করে ফেললাম তার শখের শাড়ি কিনতে যাবো দুই এক দিনের মধ্যে তারই জমানো টাকায়। এরই মধ্যে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমার ছোটভাই এসে বললো, কলেজের বেতন ও পরীক্ষার ফি বাবদ এক হাজার টাকা না দিলে আমার পরীক্ষা দেয়া হবে না ভাইয়া।

কথা শুনে ভাইয়ের মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবতে থাকলাম। কোথা থেকে যোগাড় করবো এতোগুলো টাকা! কতোক্ষণ এভাবে ছিলাম বলতে পারবো না। তবে চোখের সামনের দৃশ্য দেখে

প্রকৃতিস্থ হলাম। আমার স্ত্রী হাসি হাসিমুখে তার তিলে তিলে জমানো টাকার পুটলিটা ছোট ভাইকে দিয়ে বলছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে আজই পরীক্ষার ফি দিয়ে এসো।

ছোটভাই চলে গেলে স্ত্রী বললো, তুমি তো আমার সব, তুমি বেচে থাকলে আমার শাড়ি একদিন হবেই।

চট্টগ্রাম থেকে

টিয়া রঙ

– মোহাম্মদ আবদুল হামিদ

১৯৯১ সাল। তখন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। ইউনিভার্সিটি শাটল ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। দমকা দক্ষিণা হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি একটা গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে যাকে দেখেছি সে ধবধবে শাদা, স্বর্গের কোনো হুরপরী না হলেও চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও চেহারায় এক ধরনের গ্রামীণ লাজুকতা আর পোশাকে আধুনিকতার শালীন ছোয়া তাকে সাধারণের মাঝে অসাধারণ দেখাচ্ছিল। ভদ্রতার কারণে যেমন তার দিকে তাকাতে পারছিলাম না তেমনি চোখও ফেরাতে মন সায় দিচ্ছিল না। এলাকায় অতি ভদ্রছেলে হওয়ায় নিজের থেকে কথা বলতে পারছিলাম না।

রেল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ রেল স্টেশনটি বন্ধ করে দেয়ায় আমরা প্রায় তিনশ ছাত্রছাত্রী বিরাট সমস্যায় পড়ে যাই। কারণ সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত বাসে প্রচণ্ড ভিড় থাকে এবং মাত্র চার কিলোমিটার পরে আবার বাস পরিবর্তন করতে হয়। তাই এই স্টেশনটি এই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনশ ছাত্রছাত্রীর প্রাণের দাবি, স্টেশনটি পুনঃস্থাপনের জন্য চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপিতে সাইন নিতে গিয়ে তার বড় বোন সিনিয়র আপার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই সূত্রে আপার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং আপার বিয়েতে নিমন্ত্রণ ও বিয়ের অনুষ্ঠানে ছবি তুলতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয় মোটামুটি। কিন্তু ক্যামেরায় ব্যাটারি না থাকায় একটি ছবিও সেদিন ওঠেনি। অবাক হয়েছি যখন সে আমাকে ছবির ব্যাপারে কোনোদিন প্রশ্ন করেনি। আপার বিয়ের পরে কেন জানি না, সে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ করে দিল! তবে সে মাঝে মধ্যে আমাকে তার বাসায় ডেকে পাঠাতো তার ছোটভাইয়ের মাধ্যমে। এভাবে আলাপের মাধ্যমে তার সঙ্গে আমার ফরমাল সম্পর্কটা ধীরে ধীরে ইনফরমাল হয়ে ওঠে এবং মাঝে মধ্যে টুকটাক গিফটও সে আমাকে দিতো। তার দেয়া প্রথম গিফট হলো, *মিস হামিদ* লেখা একটা পুতুল। টিয়া কালার আমার খুবই পছন্দ তাই কোনো এক বাংলা নববর্ষে তাকে একটি টিয়া কালারের শাড়ি উপহার দিই। ভয় পাচ্ছিলাম যদি সে শাড়ি পছন্দ না করে! অপেক্ষা করছিলাম প্রতিক্রিয়া জানার জন্য অধীর আগ্রহে।

ঠিক তিন দিন পরে প্রতীক্ষার অবসান হলো। সন্ধ্যার পরে তার বাসায় যাওয়ার জন্য সে খবর দিল। খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম এই ভেবে যদি সে পছন্দ না করে, যদি ফেরত দেয়, যদি আমার রুচি নিয়ে প্রশ্ন

করে! সেসব কিছুই না করে আমাকে অপার বিস্ময়ের সাগরে ভাসালো। আমার দেয়া শাড়িটি পরে এসে সে বললো, একটু দাড়ান।

আমি সোফা থেকে দাড়াতেই সে টুক করে পায়ে ধরে সালাম করলো। আমি দুই হাতে তাকে তুলে নিতেই সে আমার বুকে ঢলে পড়লো। ওঠার কোনো লক্ষণই তার ছিল না। তার নরম বুকের ছোয়ায় এবং শরীরের মিষ্টি গন্ধে কতোক্ষণ বিভোর ছিলাম জানি না। যখন চেতনা ফিরে পেলাম তখন দেখি তার চোখের জলে আমার সমস্ত বুক ভেসে গেছে।

কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বললো, এতো মমতাবোধ নিয়ে কেউ কোনোদিন আদর করেনি, তাই আনন্দে...। জানি না, আপনি সারা জীবন আমাকে এমনভাবে বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখবেন কি না।

তারপরে আরো কতোবার তার শরীরের গন্ধ নিয়েছি। যতোবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ততোবার তাকে নতুন রূপে আবিষ্কার করেছি।

দীর্ঘ একটা দশক আমি তার শরীরের মিষ্টি গন্ধটাই ভুলতে পারিনি। সময়ের দাবির কাছে সে হারিয়ে গেল। শুনেছি সে এখন দুই সন্তানের গর্বিত জননী। সম্ভব হলে মাঝে মধ্যেই তার খবর নিই। সেই টিয়া রঙয়ের শাড়ি দুর্দান্ত যৌবনে আমাকে একটি যুবতীর সবচেয়ে কাছাকাছি এনে অনেক কিছুই দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, নারী এবং যৌবনের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেছে। কিন্তু যা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু কেড়ে নিয়েছে। হয়তো তাই আমি এখনো একা।

জিন্দাবাহার, ঢাকা থেকে

বায়না

– সাইফুল ইসলাম

ছোট কাল থেকেই আমার অভ্যাস ছিল কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে মায়ের শাড়ির আচল ধরে টানাটানি করা। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে বায়না বা জিদ ধরতাম। যে পর্যন্ত আমার বায়না পূরণ না হতো সে পর্যন্ত শাড়ির আচল ছাড়তাম না।

শাড়ির আচল ধরে টেনে দোকানে নিয়ে গিয়ে চকলেট, চানাচুর, বাদাম কিনে নিতাম। ভাত খাওয়া শেষ হলে মায়ের শাড়ির আচল দিয়ে হাত–মুখ মুছতাম।

কেউ যদি আমাকে মারতে আসতো তাহলে শাড়ির আচলের নিচে এসে পালাতাম। আমার এই অভ্যাসের মধ্যে লুকানো ছিল পবিত্র ভালোবাসা। বাবা অনেকবার এই বায়না ছাড়ানোর জন্য আমাকে মারপিট করেছেন। কিন্তু ছাড়তে পারিনি।

আমার এই বায়না ছাড়াতে বাধ্য করেছে স্থানীয় আওয়ামী গোল্ডেন বাহিনীরা। মাদারগঞ্জ এএইচজেড সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক, পরবর্তী কালে জিএস এবং গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে জামালপুর ল' কলেজে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরুর পরেই আমার ওপর চলে মামলা,

আক্রমণ ইত্যাদি। আওয়ামী বখাটে বাহিনীর অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে অবশেষে পনেরো কাঠা জমি বিক্রি করে সাত মার্চ ১৯৯৮–এ মা ও মাটি ছেড়ে কুয়েতে আসি।

আজ প্রায় চারটি বছর যাবৎ মায়ের ভালোবাসা ও সেই বায়না থেকে বঞ্চিত। শুধু স্মৃতিগুলো ধারণ করে খুব কষ্টে প্রবাসের দিনগুলো কাটাচ্ছি।

কুয়েত থেকে

টিপস

– লিনা

ভারতীয় উমহাদেশে মেয়েদের পোশাক শাড়ি অনেক আগেই প্রচলিত। তবে বিভিন্ন সময় ও স্থানে ঐতিহ্য অনুসারে এর ব্যবহারে ভঙ্গি বা নিয়ম পরিবর্তিত হয়েছে।

এক সময় ছিল যখন মেয়ে মানেই তার পোশাক শাড়ি, সেই মেয়েটি যদি ছোট্ট হয় তবুও। তবে ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক ভঙ্গিতে (কুচি ও ব্লাউজসহ) শাড়ি পরার নিয়ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় বৌদি জ্ঞানন্দিনী দেবী প্রচলন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আধুনিক ও পাশ্চাত্যের ধারায় অনুপ্রাণিত। তিনিই এ দেশে শাড়ি পরার সঙ্গে জামা ও কুচির প্রচলন করেন।

এর আগে মেয়েরা জামা ব্যবহার করতো না। কুচি ছাড়া এক পেচি শাড়ি পরতো। জ্ঞানন্দিনী দেবীই শাড়ি পরার সুন্দর নিয়ম মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তবে কিভাবে সব সময় এই শাড়ি সুন্দর করে পরা যায় ও নিজেকে সুন্দরী করে তোলা যায় তার জন্য কিছু টিপস দিলাম।

এক. শাড়ি পরার আগে শাড়ি নির্বাচনে কিছু লক্ষণীয় বিষয় হলো –

ক. অনুষ্ঠানের সঙ্গে মানানসই কি না?

খ. ঋতুর সঙ্গে মানাবে কিনা।

গ. নিজের শরীরের গড়ন ও রঙয়ের সঙ্গে শাড়ির রঙ মানানসই কি না।

ঘ. শাড়ির সঙ্গে পেটিকোট, ব্লাউজ মিলছে কি না।

দুই. শাড়ি পরার আগে জুতা পরে ফেলতে হবে।

তিন. শাড়ি ঠিকঠাক মতো গুজে প্রথমেই আচল ঠিক করে ফেলতে হবে।

চার. আচল ছাড়া থাকবে, না পিনআপ হবে তা নির্ভর করবে অনুষ্ঠানের ওপর।

পাচ. আচল ঠিক করে কুচি দিতে হবে। কুচি গোজার আগে খেয়াল রাখতে হবে সবগুলো একই সমান আছে কি না। কারণ সমান না হলে নিচের দিকে ঝুলে থাকবে।

ছয়. সুবিধা মতো পিন আটকাতে হবে।

সবশেষে খেয়াল রাখতে হবে, শাড়ি পরে আপনি ঠিক মতো হাটা–চলা করতে পারছেন কি না। কারণ শাড়ি পরে জবুথবু হয়ে বসে থাকলে তো আর আপনাকে স্মার্ট লাগবে না! এবং স্মার্ট না লাগলে সব কিছুই গুড়েবালি হয়ে যাবে। আমার টিপস কেমন হবে একবার পরীক্ষা করেই দেখুন।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, শাহী ঈদগাহ, সিলেট থেকে

এক নিমেষে

– মোহাম্মদ মানিক

তখন ২০০০ সালের মে মাস। কুয়েতের কর্মজীবনের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ছুটিতে দেশে যাবার আরো পচিশ দিন বাকি। সময়টা যেন আর কাটছে না। কতোদিন পর বাড়ি যাচ্ছি। সহসা মনের মাঝে একটা আনন্দ কাজ করছে। পরিবারের সবার জন্যই টুকিটাকি কেনাকাটা অবশ্য আগেই করে ফেলেছি। শুধু শাড়ি কেনা হয়নি। উদ্দেশ্য, কাউকে সঙ্গে নিয়ে দেখেশুনে ভালো শাড়ি কিনবো। এ শাড়িই যে আমার মনে কষ্টের কারণ হবে কখনো ভাবিনি।

এক শুক্রবারে প্রিয় বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কুয়েত সিটিতে চলে গেলাম। যথানিয়মে চা–সিগারেট খাওয়ার পর অনেকক্ষণ ঘুরে কিছু কেনাকাটা করে দুজনেই এক শাড়ির দোকানে ঢুকলাম। কাপড় কেনার জন্য বন্ধুটির খ্যাতি আছে। তেরো বছর ধরে সে প্রবাস জীবন যাপন করছে। ছয়বার বিভিন্ন দেশ সফর করেছে। তাই কেনাকাটার ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতা আছে।

বন্ধু তো একটা পর একটা শাড়ি দেখেই চলছে, দরদামও করছে। হঠাৎ শোরুমে ঝোলানো শাদা আর সোনালি সুতায় ফুল তোলা একটা কালো জামদানি শাড়ির ওপর আমার চোখ আটকে গেল। ভাবছি আমার স্ত্রী হালকা পাতলা গড়নের সুন্দর মানুষ। তাকে মানাবে বেশ। শাড়িটা আমার খুব পছন্দ হলো। এর মাঝেই বন্ধুর কথায় আমার মা, চাচির জন্য বেশ কয়েকটা শাড়ি কেনার পর দোকানির কাছে জানতে চাইলাম সেই কালো শাড়িটার দাম। দাম শুনে দোকানিকে বললাম, শাড়িটা প্যাকেট করে দিন। শাড়িটা কতো দিয়ে কিনেছিলাম সে কথা বলবো না। তার কারণ দাম দিয়ে ভালোবাসাকে ছোট করতে চাই না।

জামদানি শাড়িটা নীল পলিথিনে আর বাকি শাড়িগুলো অন্য একটা ব্যাগে দিলেন দোকানি। দাম পরিশোধ করে দুই বন্ধু দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সুন্দর বিকেল। কেন জানি আমার কাছে তখন খুব ভালো লাগছিল। ভাবলাম এবার কিছু খেয়ে নেই। তাছাড়া অনেকক্ষণ ধরে হাটছি, একটু বসতে হয়। হোটেলে সমুচা সিঙাড়ার পর চা খেয়ে কিছুক্ষণ আরাম করলাম। একবার ইচ্ছে করছিল শাড়িটা খুলে আরেকবার দেখি। কিন্তু আশপাশে অনেক লোক থাকায় সে ইচ্ছেটা চেপে রাখলাম। এরপর বন্ধুকে হোটেলে বসিয়ে রেখে ব্যাংকে কিছু দিনার ড্রাফট করে পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলাম। বন্ধুর কষ্ট হবে ভেবে ভারী জিনিসগুলো নিজে বহন করলাম। এবং সেই কালো শাড়িসহ হালকা জিনিসগুলো বন্ধুর হাতে ধরিয়ে দিলাম। বিশেষ কোনো কাজ না থাকায় সন্ধ্যার পর পরই দুজনে কর্মস্থলের উদ্দেশে বাসে চড়লাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে পড়ায় দুজনেই তাড়াহুড়া করে নামতেই বাস ছেড়ে দিল। বাস থেকে নেমেই বন্ধুর হাতের দিকে তাকালাম। উদ্দেশ্য, সব কিছু ঠিক আছে কি না দেখার জন্য। কোথায়, নীল পলিথিনের ব্যাগটা তো দেখছি না, এই মাসুদ, শাড়ির ব্যাগ কোথায়!

বন্ধু বললো, কি বলছিস তুই। মুহূর্তেই মাসুদ হতবাক হয়ে গেল।

বুঝলাম বাসের পাদানি থেকে সমস্ত জিনিস উঠালেও আমার পছন্দের শাড়িটাই ওঠানো হয়নি।
ছেড়ে যাওয়া বাসটার প্রতি দুজনেই তাকালাম। এই তো বাস পঞ্চাশ ষাট মিটার দূরে লাল সিগনালে দাড়িয়ে আছে। হায়, হায়! এখন কি করি অবস্থায় এক মুহূর্তে দেরি না করে হাতের জিনিস ফেলে দিলাম দৌড়। প্রায় চল্লিশ মিটার এসে পড়েছি। ঠিক তখনি সবুজ বাতি জ্বলে উঠেছে। আর বাসটা আবার ছুটে চলেছে। নিরুপায় হয়ে দাড়িয়ে পড়লাম। চেয়ে দেখলাম বাসটার চলে যাওয়া। লজ্জায়, দুঃখে আমার চোখে পানি এসে গেল। টাকা হারালেও এমন কষ্ট পেতাম না কি না জানি না। তবে দায়িত্বহীনতার জন্য বন্ধুর ওপর ভীষণ রাগ হলো আমার। ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে।
অসহায়ের মতো আস্তে আস্তে ফেলে যাওয়া জিনিসগুলোর কাছে এলাম। বন্ধু মাসুদ ততোক্ষণে সেখানেই দাড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন কিছুই হয়নি। আমার মেজাজটা তখন এতোটাই খারাপ হলো যে, তার সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছে করলো না। বন্ধুও নির্বাক। কারো মুখে কথা নেই। শেষে ফেরার পথে আমিই নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম, সুন্দর একটা মেজাজ নিয়ে বাসে চড়েছিলাম। বাস থেকে নামতেই এক মুহূর্তে সব আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো শুধু একটু ভুলের জন্য।
সে রাতে ভালো ঘুম হলো না। স্ত্রীর জন্য এতো পছন্দ করে শাড়িটা কিনলাম, শেষে কি না এই অবস্থা, আমার সে শাড়ি পরবে অন্য কোনো মহিলা। মেনে নিতেও কষ্ট হয়।
পরের দিন আবারও দোকানির কাছে গেলাম। বললাম, ঠিক গতকালের কালো জামদানিটির মতো আরেকটা শাড়ি দিন।
দোকানি মিষ্টি হেসে বললো, ভাই, এই চালানের শেষ মালটা আপনি গতকাল নিয়েছেন। এটা শেষ হয়ে গেছে। চাইলে আরো কিছু জামদানি শাড়ি আপনাকে দেখাতে পারি।
মনে মনে বললাম, ব্যাটা আছো শুধু ব্যবসার ধান্দায়। অন্তর্জ্বালা বলতে বোঝো কিছু? এক টুকরো হাসি দিয়ে ধন্যবাদ জানালাম। তার আর দরকার নেই, অন্যদিন না হয় আবার আসবো বলে চলে এলাম।
মনে কষ্ট নিয়েই ছুটিতে দেশে এলাম। স্ত্রীকে বললাম শাড়ি হারানোর ব্যাপারটা।
স্ত্রী বললো, রাখো তোমার শাড়ি, তুমি এসেছো এতেই আমি খুশি।
কথাটা এমনভাবে বললো যে, আমি হেসে ফেললাম। আমার অন্তর্জ্বালা এক নিমেষে দূর হয়ে গেল।

কুয়েত থেকে

ভিক্টরি পার্ক

– কিংশুক জামান

অনেক চেষ্টার পর ওলগা–কে বাগে আনতে পারে শামীম। সভিয়েট ইউনিয়নে একটি চুইংগাম কিংবা জিনসের পোশাকের বিনিময়ে সহজেই মেয়েদের পাওয়া যায় এ কথাটা শামীম শুনেছিল। তবে বাস্তবে দেখা গেল মেয়ে পাওয়া সহজ হলেও মেয়ের মন পাওয়া কঠিন। প্রথম দেখাতেই ওলগাকে

ভালোবেসে ফেলেছিল বলে মন জয়ের কঠিন পরীক্ষায় নেমেছিল শামীম। ওলগা–র মন জয় করতে পারায় শামীমের সাবেক সভিয়েট কালচারে থাকাটা এখন আর বোরিং নয়।

শহরের কোলাহল ছেড়ে তারা প্রায়ই চলে আসে ভিক্টরি পার্কের দৃষ্টিনন্দন সবুজ ছায়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ের স্মৃতিকে ধরে রাখতে বিশালায়তনের এই পার্কে রয়েছে স্মৃতিসৌধ এবং চারদিকে বিচিত্র বৃক্ষরাজি। কেবল কারে করে পুরো পার্কটা ঘুরে বেড়ানো যায়। এই পরিসরে মনটা উদার হয়ে গেলেও শামীম একটি বিষয়ে ওলগার উদারতার ছোয়া পায়নি। শামীম অনেকবার ওলগাকে গৃহবধূ করে বাংলাদেশে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছে। এশিয়ান ভীতির কারণেই কিংবা নারীবাদী তসলিমা নাসরিনের বিদেশে আশ্রয়ের কাহিনী শুনে ওলগা বাঙালি বধূ হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়নি বলে শামীমের ধারণা। এরপরও আশা ছাড়েনি শামীম।

একদিক পার্কের মাঝে হাটতে গিয়ে শামীম ও ওলগা একটা মন্দিরের সামনে এসে হাজির হলো। এই নির্জন পার্কের ভেতর কৃষ্ণ মন্দির। ভেতরে *হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ* বলে খাটি বাংলায় কীর্তনের ক্যাসেট বাজছে। রাশিয়ান মেয়েরা শাড়ি পরে হাতজোড় করে, চোখ বুজে, শরীর দুলিয়ে কৃষ্ণের নাম কীর্তন করছে। ওলগা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। নীরবতা ভেঙে ওলগা জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, তাদের পরনে কি ওটা শাড়ি?

শামীম হ্যা জবাব দিল।

ওলগা প্রশ্ন রাখলো, এই শাড়ি কি তোমার মা–বোনেরা সবাই পরে?

শামীম আবার হ্যা জবাব দিল।

শাড়ি পরাটা মনে হয় খুব কঠিন। ওলগার মন্তব্য।

এক সপ্তাহ পর। ভিক্টরি পার্কে ওলগার আসার কথা। নির্দিষ্ট সময়ে ওলগা আসেনি। মনটা খারাপ হলো শামীমের। কখনো এমন হয় না। ফেরত চলে যাবে কি না ভাবছিল। হঠাৎ ডানে তাকিয়ে দেখে কে জানি দূরে বসে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এই বিদেশ–বিভুই–এ শাড়ি পরা কোনো মেয়ে বসে আছে! কাছে যেতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো শামীম। এতো ওলগা! রাশিয়ান রমণীর ধবধবে তুলতুলে শরীরে শাড়ি পরা ওলগাকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। ওলগার হঠাৎ এই পরিবর্তনে শামীম কি বলবে তা ভেবে পাচ্ছিল না।

ওলগা উঠে শামীমকে জড়িয়ে ধরলো এবং নীরবতা ভেঙে ওলগা বললো, তুমি না আমাকে তোমার দেশে নিয়ে যাবে বলেছিলে। আমি ঠিক করেছি বাংলাদেশে যাবো। বলতে পারো এ শাড়িই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে কেমন লাগছে শাড়িতে?

শামীমের মুখ থেকে জবাব এলো, *অর্চিন ক্রেসিভাইয়া* অপরূপ সুন্দরী।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

ঔরঙ্গবাদী

– নিপুণ

সকালে প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশে বাইসাইকেল নিয়ে বের হলাম। যদিও শরৎকাল তবুও বৃষ্টির রেশ তখনো শেষ হয়নি। শাদা মেঘের মেলা মাঝে মধ্যেই হঠাৎ কালো আকার ধরে বসে। অমনিতেই নেমে পড়ে বাধনহীন মুষলধারে বৃষ্টি। সকাল থেকে সূর্যের আলো দেখা যায়নি। আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। যে কোনো সময় বৃষ্টি নেমে যেতে পারে। তাই সাইকেল খুব দ্রুত চালাচ্ছিলাম। পথে সুশির সঙ্গে দেখা। ঢাকা থেকে লঞ্চে এসেছে। আবহাওয়ার অবনতির কথা ভেবে তার সঙ্গে আর কথা বলতে পারলাম না। তাছাড়া তার সঙ্গে তার আপু ছিল। পরে কথা হবে এই বলে বিদায়।

সারাটা দিন প্রায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে সাময়িক বিরতি পেয়েছি। তখন বৃষ্টি নেই। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে। আমার রুমে জানালার পাশে বসে আছি। গোধূলি সন্ধ্যায় এখানে বসলে মাঠের রাখাল, নিড়ে ফেরা ক্লান্ত পাখির ঝাক দেখা যায়। আজ সে রকম কিছু চোখে পড়ছে না। চারদিকে কিছুটা অন্ধকার নেমে আসছে। জানালা ছেড়ে উঠে যেতে মন চাচ্ছিল না। এমন সময় জানালার রড ধরে এসে দাড়ালো সুশি। আমাদের বাড়ি পাশাপাশি। সেই অ, আ–র ধুল খেলা থেকে আমাদের ওঠা–বসা। বর্তমানে একটি দিন তার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে পৃথিবীটাকে অন্ধকার মনে হয়।

আজ প্রায় দুই মাস পর সে ঢাকা থেকে বাড়িতে ফিরেছে। তাই কিছুটা রাগ করে বসে আছি তার ওপর। জানালা ধরে বেশ কিছুটা সময় দাড়িয়ে থেকে আমি কথা বলছি না বলে চলে গেল। যাবার বেলায় আমার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেল। রাতে পড়তে বসে হঠাৎ মনে হলো কাগজটির কথা। খুলে দেখি তাতে লেখা, *রাত এগারোটায় আসবো, অপেক্ষা করো।*

সেই দিন আর পড়া হলো না। কিছু আনন্দ, কিছু অভিমান, কিছুটা ভয়ের মধ্যে কাটতে লাগলো প্রতিটি মিনিট। এগারোটা আর আসছে না। মনে হচ্ছিল আজ এগারোটা অনেক দূরে চলে গেছে। তখন এগারোটা বাচতে দশ মিনিট বাকি।

হঠাৎ জানালায় মৃদু নখের টোকা। শিউরে উঠলাম। জানালা খুলে দেখি চাদের আলোতে ঝলমল করছে ঔরঙ্গবাদী এক সিল্কের শাড়ি পরে মূর্তির মতো দাড়িয়ে আছে সুশি। শাড়ি পরাতে তাকে দেখতে আজ ঠিক উড়ন্ত পরীদের মতো লাগছে। আমি কথা বলছি না। পলকহীন কিছুটা সময় চেয়ে রইলাম তার দিকে। পরে সেই শুরু করলো।

কি অবাক হয়েছো বুঝি? বাইরে এসো?

আমি বাইরে এলাম। তার সামনে দাড়াতে কপালে ছোট একটি চুমু।

এটি তোমার এতো দিনের উপহার। এবার আমার পাওনা পরিশোধ করবে, নাকি রাগ করেই থাকবে? দেখো, আমি দিনেই তোমার সঙ্গে দেখা করতাম। একটি বিশেষ কারণে আসিনি। চলো, পুকুরের ওপারে গিয়ে বসি। সেখানে বসে অনেক কথা হবে।

পরে বিভিন্ন গল্পের ভিড়ে জানলাম শাড়িটি তার আন্টি দিয়েছে। এর আগে কখনোই সে শাড়ি পরে আমার কাছে আসেনি। আজ প্রথম শাড়ি পরে আসাতে তাকে দেখতে ঠিক বড়দের মতো লাগছিল।

নিজেই অনুভব করলাম, আমিও মনে হয় অনেকটা বড় হয়ে গেছি। ঘড়ির দিকে তাকালাম। চেয়ে দেখি দু'টা বেজে গেছে। আকাশ হঠাৎ আবার কালো মেঘে ঘিরে ফেলেছে। সুশিকে চলে যেতে বললাম। সে যেতে চাইলো না। মুহূর্তে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে এলো।

রুমে ফিরতে দুজনেই ভিজে একাকার। কি করা যায়, কি করে সে এই ভেজা কাপড়ে তার ঘরে যাবে তাই নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। পরে তাকে অনেক বুঝিয়ে তার পরনের শাড়ি আমিই খুললাম। ভালোভাবে চিপে কাপড়টিকে আমার রুমে নেড়ে দিলাম। ভাবলাম এতে হয়তো এটি কিছুটা শুকাবে। শাড়ি খোলার পর সুশিকে দেখতে আরো বেশি সুন্দর লাগছিল। পরনের ছোট ব্লাউজ, পেটিকোট যেন তাকে খুব জোরে চেপে ধরেছে। পেটিকোটটির শুরু তার নাভির অনেকটা নিজ থেকে। বুকটা দেখতে দুটি ভলিবল। একবার তার নাভির দিকে, একবার বুকের দিকে তাকাচ্ছিলাম।

সে কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেল। এক হাতে বুক, এক হাতে নাভি চেপে ধরলো। আমাকে বললো, এই দুষ্ট, এদিকে তাকিও না। বাতি অফ করে দাও।

চোখ সে তো কোনো বাধা মানে না। ইচ্ছা হলো তাকে একটু ছুয়ে দেখতে। কিন্তু কিছুতেই সে রাজি হচ্ছিল না। আমার উত্তেজনা দেখে পরে সে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। আস্তে করে কাপা শরীরে তার সামনে গিয়ে দাড়ালাম। আমার ছোয়ায় সে মোমের মতো গলতে শুরু করলো। এক সময় দুজনেই চলে গেলাম এক অচেনা জগতে। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম শাড়িটিকে ধন্যবাদ দিলাম।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, সিঙ্গাপুর, থেকে

যাত্রাপথে

– মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান

আমরা তিন বন্ধু আমি, মমিন, তাজ পাশের স্মরণপুর গ্রামের মধ্যে আকাবাকা পথ দিয়ে সাইকেলে করে যাচ্ছিলাম। রাস্তার দুই পাশে ধানক্ষেত, আশপাশে বেশি বাড়ি–ঘর নেই। বাজার থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার হবে। আমরা যাচ্ছি সাইকেলে। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এক সাইকেলে একজন পুরুষ ও মহিলা। তারা সম্ভবত স্বামী–স্ত্রী। তাদের বিয়েটা বেশি দিন হয়নি। হঠাৎ যেতে চোখ পড়লো মেয়েটার শাড়ির আচলটা সাইকেলে পেছনের চাকায় জড়াচ্ছে। সাবধান করার আগে আচলটা এমনভাবে জড়ালো যে, শাড়িটা টান পড়ে বুক থেকে সরে গেছে। আর এমন সময়ে পেছন থেকে ইটের ট্রাক দ্রুত আসছিল। তাই আমরা তাদের সাইকেলে সামনে এমনভাবে ব্রেক করলাম যাতে ট্রাক ড্রাইভার বুঝতে পারে যে, কিছু হয়েছে। তারপর ট্রাক পাশ কেটে চলে গেল। আমরা তিন বন্ধু তাদের এই বিপদে কিভাবে সাহায্য করা যায় তাতে মনোযোগ দিলাম। শাড়িটি এমনভাবে জড়িয়েছে যে, ছাড়াতে হলে ছিড়তে হবে বা কাটতে হবে। এজন্য পাশের বাড়ি থেকে কাচি আনলাম এটা কাটতে।

অমনি মেয়েটি আত্মসুরে কেদে উঠে বললো, ভাইয়া, আমার শাড়িটি কাটবেন না। এই শাড়িটা আমার বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক টাকা দিয়ে আমার মাকে কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু

দুর্ভাগ্য আমার মা হঠাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে একদিনও পরতে পারেননি। তাই আমার বাবা আমার বিয়ের সময়ে এটি দিয়ে বললেন, এটি তোর মায়ের শেষ সম্বল, যত্ন করে রাখিস। আরো একবার অনুরোধ করে বললো, দয়া করে কাটবেন না।

তখন উপায় না দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম সাইকেল খুলতে হবে। কিন্তু আশপাশে কোনো সাইকেল গারাজ নেই। যা রয়েছে তিন কিলোমিটার দূরে। আর এভাবে কোনো নতুন বৌকে নিয়ে যাওয়া তার জন্য লজ্জার ব্যাপার। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম এখান থেকে কোনো রকম খুলে ছাড়ানো যাই কি না। তাই বন্ধুকে বললাম, একটা ইট আনতো দেখি, কিছু করা যায় কি না?

যখনি এটা ব্যবহার করতে যাবো তখন সে বললো, আমার সাইকেল দুই তিন দিন কিনেছি, এটাতে এমনভাবে আঘাত দেবেন না।

মনে মনে বললাম বড় জ্বালায় পড়লাম তো। বৌ তার মায়ের শেষ চিহ্ন রক্ষা করবে। স্বামী তার দুই তিন দিনের কেনা সাইকেল আঘাত দিতে দেবে না। তারা দুটির একটিও নষ্ট হতে দেবে না। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মানুষ এসে গেছে। আবার প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

তাই পাশের বাড়ি থেকে অনেক অনুরোধ করে একটা শাড়ি আনলাম, সঙ্গে একটি মেয়েকে ডেকে আনলাম। আমরা চারপাশ আড়াল করে রাখলাম। মেয়েটি সেই শাড়িটি পরিয়ে দিল।

পরবর্তী সময়ে আমরা অনেক কষ্ট করে তিন কিলোমিটার পথ সাইকেল উচু করে সাইকেলের গারাজে গেলাম।

শাড়ি খুলতে গিয়ে সাইকেলে আঘাত দিচ্ছিল। আমরা সেদিকে লক্ষ্য করছিলাম। আর বন্ধু তাজ দেখলো সাইকেলের আঘাতের সঙ্গে সে এমনভাবে কেপে উঠছে যেন তার বুকে লাগছে। তার বৌয়ের শাড়ি ছিড়তে পারে তাতে কোনো দুঃখ নেই। আনন্দের ব্যাপার হলো, শাড়ির কিছু হয়নি শুধু কালি লেগেছিল।

যাওয়ার সময় বৌটি মিনতি কণ্ঠ স্বরে বললো, ভাইয়া, আপনাদের উপকারের কথা কোনোদিন ভুলবো না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার স্বামী ধন্যবাদ তো দূরের কথা কিছু না বলে চলে গেল।

পায়রা ডাঙ্গা, ঝিকরগাছা, যশোর থেকে

কাজল

– মোহাম্মদ সেলিম ভূইয়া

কাজল। তাকে এই নামে ডাকতাম। তার চোখের দিকে তাকালে আমার মনে হতো বিধাতা পরম যত্নে সবটুকু সৌন্দর্য দিয়ে তার চোখ দুটো সৃষ্টি করেছেন এবং যত্ন সহকারে চোখ দুটোতে কাজল মাখিয়ে দিয়েছেন।

কাজলকে প্রথম দেখি আমাদের কলেজের মেয়েদের কমনরুমে। তখন আমি অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সেদিন ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য করিডোর ধরে হেটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি মেয়েদের কমনরুমে অতি সুন্দর একটা মেয়ের দিকে আটকে যায়। থমকে দাড়াই। মেয়েটি উদাস চোখে বাইরের প্রকৃতি দেখছিল। এমন গভীর–কালো বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দর দুটি চোখ আগে কখনো দেখিনি।

একবার, দুইবার নয়, হ্যাংলার মতো অপলক দৃষ্টিতে শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কতোক্ষণ সময় কেটে গেল জানি না। হঠাৎ সে আমাকে খেয়াল করলো এবং কমনরুমের অন্যদিকে চলে গেল। কাজলকে প্রথম দেখার কিছুদিন পর তার সঙ্গে কথা ও পরিচয় হয় আমার বন্ধুর ছোটবোনের জন্মদিন অনুষ্ঠানে। তখন জানতে পারলাম তার বাবা কিছুদিন আগে বদলি হয়ে এখানে এসেছেন এবং সে আমাদের কলেজে এইচএসসি ভর্তি হয়েছে ফার্স্ট ইয়ারে। পরদিন তার ক্লাস রুটিন জেনে নিয়ে সকাল দশটার মধ্যে কলেজে আসা শুরু করলাম। আমার ক্লাস শুরু হতো বারোটায়। তবুও শুধু তাকে দেখার জন্য দশটার মধ্যে কলেজে চলে আসতাম। কোনোদিন তার দেখা পেতাম, কোনোদিন পেতাম না, কোনোদিন আবার দৃষ্টি বিনিময় হতো, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে টুকটাক দুই একটা কথা হতো। দিনকে দিন তার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতে থাকলাম। কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ভয় প্রভৃতি কারণে তার প্রতি আমার প্রবল ভালোলাগার কথা তাকে জানাতে পারলাম না। মহা উৎকণ্ঠায় আমার দিনগুলো কাটছিল। অবশেষে একদিন প্রবল সাহস নিয়ে ভয়, দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাকে আমার মনের কথা বলে ফেললাম।

সে মুচকি হেসে বললো, আমি অনেক আগে থেকেই আপনার মনোভাব টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনার কাছ থেকে শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।

শুরু হলো আমার ও কাজলের ভালোবাসার স্বপ্নিল এক অধ্যায়। কি সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। ক্লাসের ফাকে আমরা কথা বলতাম। মাঝে মধ্যে তার হাত দুটো আমার হাতে নিয়ে বসে থাকতাম। তার গভীর কালো চোখের দিকে অপলকভাবে চেয়ে থাকতাম। সে বলতো, তুমি আমার চোখের দিকে অপলকভাবে চেয়ে কি দেখো? কি খোজার চেষ্টা করো?

বলতাম, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মায়াবী চোখ দুটোর মধ্যে আমার ভালোবাসা দেখতে পাই, তোমার ভালোবাসা অনুভব করতে পারি তাই চেয়ে থাকি।

মাঝে মধ্যে ক্লাস ফাকি দিয়ে আমরা বাইরে ঘুরতে চলে যেতাম। কতো কথা যে আমাদের মাঝে হতো। সে বলতো, আমি শুনতাম। আমি বলতাম, সে শুনতো। এভাবেই আমাদের ভালোবাসার পরিপূর্ণ দিনগুলো যাচ্ছিল।

একদিন আমি ও কাজল তার বান্ধবীর জন্মদিন উপলক্ষে গিফট কেনার জন্য মার্কেটে গেলাম। হঠাৎ মার্কেটে একটি শাড়ির দোকানের শোকেসে হালকা নীল রঙ–এর সুন্দর একটি শাড়ির দিকে আমার চোখ পড়লো। তাকে শাড়িটি দেখিয়ে বললাম, তোমাকে এই শাড়িতে খুব সুন্দর লাগবে।

কাজল ইয়ার্কি করে বললো, এমনি আমি অসুন্দর নাকি? তাছাড়া আমি শাড়ি পরতে কমফোর্ট ফিল করি না। শাড়ি পরে তা মেইনটেইন করা আমার কাছে কঠিন মনে হয়। তাই শাড়ি পরি না।

তখন হেসে বললাম, বাঙালি নারীকে শাড়িতেই সবচেয়ে সুন্দর ও আকর্ষণীয় লাগে।

কাজল মৃদু হেসে বললো, ঠিক আছে। আগামী পাচ তারিখ আমার জন্মদিনে তুমি শাড়ি উপহার দিও। আমি আগ্রহের সঙ্গে তোমার উপহার দেয়া শাড়ি পরবো। তার আগে আম্মুর কাছ থেকে শাড়ি পরার কৌশল শিখে নেবো।

পরদিন মার্কেটে গিয়ে ওই হালকা নীল রঙ–এর শাড়িটি কিনে ফেললাম। অবশেষে পাচ তারিখ কাজলের জন্মদিনে তাকে শাড়িটি উপহার দিই। কাজলকে আত্মীয়, বন্ধু–পরিজনের মাঝে খুবই সুখী দেখাচ্ছিল। সবার অগোচরে কাজলকে ক্ষণিকের জন্য একা পেয়ে কানে কানে বললাম, কাল তুমি শাড়ি পরে কলেজে আসবে। তোমার জন্য দশটা থেকে কলেজে অপেক্ষা করবো। কাজলদের বাসা থেকে দারুণ ভালোলাগা নিয়ে আগামীকালের প্রতীক্ষায় বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

৬ তারিখ। আমার জীবনে সেই ভয়াবহ দিন। সকাল সাড়ে নয়টায় কলেজে চলে এলাম। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। এগারোটা বেজে চললো। তবুও কাজলের দেখা নেই। আগে কখনো এমনটি ঘটেনি। অজানা আশঙ্কায় সামান্য উৎকণ্ঠা দেখা দিল। হঠাৎ কাজলদের প্রতিবেশী এক বান্ধবী আমাকে সেই ভয়াবহ সংবাদটি জানালো। কাজল হাসপাতালে। আমার মনে হলো, হঠাৎ পৃথিবীটা দুলে উঠলো। উল্কার বেগে হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে পাগলের মতো কাজলকে খুজতে লাগলাম। বার্ন ইউনিটের সামনে কাজলের আব্বু, আম্মু, আত্মীয়দের দেখা পেলাম। তারা সবাই কাদছে। বার্ন ইউনিটের একটি বেডে কাজলের দেখা পেলাম। কিন্তু একি দেখছি! কাজলের সারা শরীর শাদা ব্যান্ডেজে আবৃত্ত। কি বীভৎস সেই দৃশ্য। হাউমাউ করে কেদে উঠলাম। হঠাৎ দেখি কাজল একটু চোখ মেলে তাকালো। কি সুন্দর, কি নিষ্পাপ সেই চোখ দুটো। সর্বনাশা আগুন তার সব সৌন্দর্য কেড়ে নিতে সক্ষম হলেও চোখ দুটোর সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারেনি। আমার দিকে তাকালো। কাজলের চোখে একটি অতৃপ্তির ছায়া দেখতে পেলাম। আমার মনে হলো তার চোখ দুটো বলছে, শাড়ি পরিহিত অবস্থায় আমাকে কেমন দেখায় তোমাকে দেখাতে পারলাম না। আস্তে করে কাজলের চোখের পাতা দুটো বুজে গেল। আমার কাজল আমাকে ছেড়ে অন্য এক জগতের উদ্দেশে যাত্রা করলো। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম।

তারপর কয়েকটা দিন কিভাবে কাটলো বলতে পারবো না। আস্তে করে নিজে স্বাভাবিক হতে লাগলাম। জানতে পেলাম আমার উপহার দেয়া শাড়িটি পরে কলেজে আসার প্রস্তুতি কাজল নিচ্ছিল। সময় কম থাকায় এবং কাজের বুয়া অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় কাজল নিজেই রান্নাঘরে চা তৈরি করতে যায়। অসাবধানে শাড়িটিতে আগুন লেগে যায় এবং দ্রুত আগুন সারা শরীরে ছড়িয়ে পরে। কাজলের চিৎকারে বাসার সবাই গিয়ে আগুন নেভায় এবং দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার কাজল বাচে না। আগুনের কাছে, নিয়তির কাছে সে হার মানে। পৃথিবী থেকে একটি অতৃপ্তি নিয়ে দূর অজানায় চলে গেল। আমারই উপহার দেয়া শাড়ি তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ালো। আমার সমস্ত ভালোবাসা নিয়ে কাজল আমাকে নিঃস্ব করে চলে গেল।

মাঝে মধ্যে মনে হয়, বোধহয় আমিই কাজলের মৃত্যুর জন্য দায়ী? যদি তাকে শাড়িটি উপহার না দিতাম তাহলে হয়তো কাজল আজো আমার জীবনে ভালোবাসার ফুল নিয়ে আসতো।

ব্রাহ্মন্দী, নরসিংদী থেকে

ভেজা

আমি দুই বাচ্চার মা। একদিন স্বামী এসে বললো, একটু দাড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিলাম, তাও পারলাম না। ম্যাজিস্ট্রেটের বৌটা বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে গোসল করছে। আমাকে দেখেই বারান্দার দিকে এগিয়ে এসে হাসছে আর ভিজছে।

আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, মহিলার কি দোষ? আমার স্বামীর মতো এমন ছয় ফিট ফর্শা, স্মার্ট সুপুরুষ দেখলে...!

হঠাৎ বুকে স্পর্শ পেতেই বললাম, কি ব্যাপার, অতো বিশাল বুক দেখা বাদ দিয়ে এখানে এলে যে...।

সে বললো, কি যে বলো। ভেজা শাড়িতে দুই পাশে দুই লাউ ঝুলে আছে। নিপল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এতো বিশ্রী লাগছে। হঠাৎ তোমারটা মনে হতেই ছুটে এলাম।

এই মহিলার কি বিশাল আর আমার তো মাত্র থার্টি-ফোর।

ও তখন বললো, শোনো তাহলে একটা ভোটের গল্প। একবার সউদিতে আমাদের মেসে ভোট হয়েছিল। বিষয় ছিল বিগ ব্রেস্ট, স্মল ব্রেস্ট। আমি বিগটায় ভোট দিলাম। ফলাফল গণনায় দেখা গেল স্মলটাই জয়ী। কারণ খাড়া থাকে। দেখলেই ছুতে ইচ্ছা হয়, সেক্স এসে যায়। সহজে গড়ায় না। এক হাতের মধ্যে ভালোভাবে ধরা যায়। আর বড়টা এক হাতে ধরা যায় না। ব্রা খুললেই ঝপাৎ করে ঝুলে পড়ে। ডার্লিং, সে জন্যই তো! বলতেই সে মুখটা নামিয়ে আনলো।

মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ভেজা শাড়িকে। কারণ সে জন্যই তো জানতে পারলাম কোনটা আকর্ষণ করে পুরুষকে...!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, পাবনা থেকে

প্রেমিক টেস্ট

– অনামিকা

কম বেশি সবারই একটা হবি বা শখ থাকে। আমারও একটা অদ্ভুত শখ আছে। আমার শখ হচ্ছে বিভিন্ন রকম ড্রেস পরা। কখনো লুঙ্গির সঙ্গে চেক শার্ট, কখনো গেঞ্জি, কখনো স্ক্রিন টাইট প্যান্টের সঙ্গে চেক শার্ট আবার কখনো শাড়ি পরা। আমি বাসায় সাধারণত থ্রি-পিস পরি আর শখের বশে এক আধঘণ্টার জন্য এসব পরি।

আমার ইয়ে মানে আমি যাকে জ্বালাই এবং যে আমাকে জ্বালায় সে একজন উন্নতমানের দোকানদার। দিনের বেশির ভাগ সময়ই নিজের দোকান বন্ধ করে অন্যের দোকানে বসে সে আড্ডা দেয়। তার বাসা আমাদের পাশেরটা। এবং বাসা থেকে দোকান দুই মিনিটের পথ। তার দোকানে যেতে মাঝে আরেকটা দোকান। তারপর অন্ধকার রাস্তা। মাঝ পথের সে দোকানে আমার চামচারা বসে থাকে। সেদিন ঠিক করলাম, সন্ধ্যার পর আমাদের পাড়ার বয়স্কা মহিলাদের স্টাইলে শাড়ি পরে তার

দোকানে যাবো। কিন্তু আমার ইয়ের চরিত্র নাকি একটু খারাপ বলে শুনতে পাই। এটা বাস্তবে দেখার জন্যও আমার যাওয়া। যাবার আগে প্রস্তুতি এবং সাবধানতা অবলম্বন করতে দুই ঘণ্টা লাগলো।

আমার বাবা চিটাগাং গিয়েছিলেন এবং আমার মাকে ফাকি দেয়া কোনো ব্যাপার না। তাই আমার এই দুঃসাহস। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে দরজা লাগালাম পড়ার নাম করে। এরপর ব্লাউজ পরে নিচের দিকটা সুই–সুতা দিয়ে এমনভাবে সেলাই করলাম যাতে একটা আঙ্গুলও ঢুকানো না যায়। নিচে একটা প্যান্টি। তার ওপর একটা টাইল্‌স এবং এর ওপর একটা চুড়িদার পায়জামা পরলাম। কোনো এক ভালোবাসা সংখ্যার সেই আপুটার মতো মরা গিট দিলাম। এরপর আরেকটা পায়জামা পরে তাতে মরা গিট দিলাম। অবশেষে পেটিকোট পরে আমাদের পাড়ার স্টাইলে শাড়ি পরলাম। তারপর আম্মার গতিবিধি লক্ষ্য করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মাঝ পথের সেই দোকানটি নিরাপদে পার হয়ে এলাম। আমার চামচারা আমাকে চিনলে নির্ঘাত পিছু নিতো।

তার দোকানে পৌছানোর পরে আগের অভ্যাস মতো অন্ধকারে দাড়িয়ে থেকে দোকানের পাল্লায় নক করলাম। এর আগেও একবার তার দোকানে গিয়েছিলাম শাড়ি পরে। তবে সেদিন একা ছিলাম না, সঙ্গে আমার খালা ছিলেন। আজ একা। মাথায় ঘোমটা টানা। তার একবার মনে হচ্ছিল ঘোমটাওয়ালি আমিই। আবার এও মনে হচ্ছিল যে, আমাদের মতো পরিবারের হয়ে আমি সন্ধ্যার পর একা আসতেই পারি না। অর্থাৎ ঘোমটাওয়ালি অন্য কেউ। সে তখন কনফিউশনের মধ্যে ছিল। এর জন্য কথাও বলতে পারছিল না। এরপর ঘোমটা তুলে দিলাম। সে তো অবাক। আমি!

এরপর অনেক কথা হলো দুই চারটা জিনিস কিনলাম। ভাংতি নেই বলে টাকাটা নিচ্ছিল না। অনেক সাধাসাধির পরও নিল না। তখন বাসায় আসার জন্য পা বাড়ালাম। সে আমাকে এগিয়ে দিতে সঙ্গে আসছে। আমি প্রহর গুনছি এক দুই তিন চার পাচ। হঠাৎ সে আমাকে থামতে বললো। থামলাম না। আমার হাত ধরে ফেললো। তার চরিত্রের খারাপ দিকটার জন্য অপেক্ষা করছি। আমাকে জড়িয়ে ধরলো খুব শক্ত করে। তারপর একের পর এক কিস–এর ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। সেই সঙ্গে তার হাতটাও লক্ষ্য বস্তুকে ধরার জন্য অগ্রসর হতে লাগলো। এক সময় পৌছে গেল। কুকড়ে গেলাম। এরপর একটু নিচে মানে, আমার সেলাই করা জায়গায় ফুস ফুস ভর্তি করে বাতাস নিলাম যাতে পেট উচু হয়। একটা আঙুলও না ঢুকতে পারে।

হাত ঢোকাতে পারলো না। উপরেই অসফলতার সঙ্গে কিছুক্ষণ চালালো। এরপর মনে হলো হঠাৎ তার নিচের কথা মনে পড়েছে। অনেক চেষ্টার পর তার হাতের চারটা আঙুল পায়জামার ফিতা থেকে নিচে নামলো। কিন্তু তার বেশি নয়। বাতাস ভরা পেট দিয়ে চেপে ধরলাম।

আরো কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বললো, ওহ, অতি চালাক!

আরেকটা কথা। আমার পেটিকোট সে তুলেছিল এবং ফিতা খোলারও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সব কিছুতেই অকৃতকার্য।

এরপর তাকে বিদায় বেলার উপহার স্বরূপ একটা কিস দিয়ে দিলাম এক দৌড়।

কিছুদূর এসে একটা আছাড় খেলাম। আমি খুব রোগা পাতলা। এমনিতেই দৌড়াতে পারি না। তারপর নিচের দিকে ছয়টা কাপড়।

বাসায় ফিরে একবার ভাবলাম খুব বোকামি করলাম। আবার ভাবলাম, না, খুব চালাকি করলাম। আমার বাবা আমাকে বলে, তুমি খুবই বোকা এবং অতিশয় চালাক। কোনটা সত্যি?

পিরিতপাড়া থেকে

গ্রামীণ শপিং

– কবির আহাম্মেদ

গ্রামাঞ্চলে বিয়ের শপিং করতে ছেলে ও মেয়েপক্ষ উভয়ই মার্কেটে আসে। ছেলেপক্ষের নজর থাকে ছেলেকে কম দামে কোনো পোশাক বা ব্যবহৃত জিনিস কিনে দেয় কি না। মেয়েপক্ষও একইভাবে নজর রাখে ছেলেপক্ষের দিকে।

এবার মজার এক বিয়ের শপিং–এর কথা। আমি গ্রামের বাড়িতে এক বিয়েতে গিয়েছিলাম। গ্রামের নিয়ম অনুসারে আমরা মেয়েপক্ষ ও ছেলেপক্ষ মার্কেটে এলাম। আমাদের সঙ্গে বর নিজে এসেছে। বরের মাথায় বাণ্ডি সুতায় বোনা টুপি, মুখে রুমাল – হাতে ফুল করা, পরনে পাঞ্জাবি–পাজামা। আমার পক্ষ অর্থাৎ মেয়েপক্ষ থেকে বরকে ১০০% পার্সেন্ট জাপানি ট্যরে কাপড়, জাপানি প্যান্ট পিস, স্টান্ডার্ড লুঙ্গি, বাটা জুতা কিনে দেয়া হলো। আমাদের পছন্দে ছেলেপক্ষ কিছুটা অবাক। কারণ আমাদের কেনাকাটা ছিল খুবই পছন্দনীয়। কোনো কম দামি জিনিস আমরা কিনিনি।

এবার মেয়ের জন্য ছেলেপক্ষের শাড়ি কেনার পালা। মেয়ের জন্য শাড়ি কিনবে অথচ দোকানদারের কানে কানে কি যেন বলে নিল ছেলেপক্ষের একজন। কম দামি শাড়ি বের করলো দোকানদার। নতুন শাড়ি বের করতে বললে দোকানদার বলে, যেগুলো দেখিয়েছি এগুলোই নতুন। মেয়ের বাবাকে বললাম, ওরা দোকানাদারকে বলেছে এর থেকে ভালো শাড়ি না বের করতে। সবাইকে বললাম, চলুন, আমরা অন্য দোকানে যাই। এখানে শাড়ি পছন্দ হয় না। সবাই আমার সঙ্গে বলে উঠলো, হ্যা হ্যা অন্য দোকানেই যাবো। আমরা অন্য একটা শাড়ির দোকানে গেলাম। বিয়ের শাড়ি ভালো দেখে বের করতে বললাম, সত্যিই দোকানদার খুব ভালো শাড়ি বের করলেন। ছেলেপক্ষের লোকজনকে বললাম, দেখে নিন বিয়ের শাড়ি। একটা দামি শাড়ি কিনবেন তাও কিপটেমি করছেন। শাড়িটা তো আপনাদের বৌই পরবে।

ছেলেপক্ষের একজন শাড়ির দাম জানতে চাইলো।

দোকানদার বললো, তিন হাজার টাকা। জামাই মুখের রুমাল সরিরে বললো, একটা শাড়ি তিন হাজার টাকা! আরো কম দামি শাড়ি দেখান।

বললাম, সে কি, তোমার জন্য যে জুতা কিনেছি তার দামই তো ১৫০০ টাকা। আর তোমার বৌয়ের জন্য তুমি তিন হাজার টাকা দামের শাড়ি কিনতে পারবে না।

মেয়ের বাবা ছিলেন খুবই রাগী মানুষ। তিনি বললেন সবাই যেই শাড়িটা পছন্দ করেছে সেটাই কিনতে হবে।

ছেলে বললো, তা হবে না। তিন হাজার টাকা দিয়ে তো আর একটা বিয়ে করতে পারি।

উভয়পক্ষের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেলে। মেয়েপক্ষ ভারী থাকায় ঘটে গেল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। এক পর্যায় মেয়ের বাবা হাতের ছাতা দিয়ে জামাইকে ছাতাপেটা শুরু করলেন। মার্কেটের ভেতরে হই চই শুরু হয়ে গেল। কেউ বলছে, ধর ধর, পিডা, হুশ হুশ, মার শিন্নি জামাইর। জামাইর তাউল্লা পাচাইয়া, এক অন্য রকম মিউজিক। এক সময় সবাই শান্ত হলো, ছেলেপক্ষ নিজেরা আলাপ সেরে তিন হাজার টাকা দামের শাড়ি কিনে দিতে রাজি হলো।

মেয়ের বাবা আমাকে বললেন, দেখেছো গ্রামের বিয়ের কি অবস্থা।

বললাম, জি, সত্যিই অদ্ভুত এক বিয়ের কেনাকাটা উপভোগ করলাম। আমি কখনোই এ ধরনের বিয়ের শাড়ি কেনাটাকায় অংশগ্রহণ করিনি।

আমরা কথা বলছি হঠাৎ জামাইয়ের এক বন্ধু বললো, কি দোস্ত, তিন হাজার টাকা দামের শাড়ি তো দিলিই, ছাতির পিটা আর কাদলি ফাও।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

সদর রোড, ভোলা থেকে

অপহৃত অহঙ্কার

– নীলা

আমার স্কুল জীবন কেটেছে কুমিল্লার এক মফস্বল শহরে। বরাবরই ভালো ছাত্রী এবং সুন্দরী হিসেবে পরিচিত। সমাজে পেতাম অন্য এক ধরনের মূল্যায়ন যা ধীরে ধীরে আমাকে করে তোলে অহঙ্কারী, একরোখা এবং তীব্র জেদি।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় থেকেই বিভিন্ন ছেলেদের অফার পেতে লাগলাম। ইচ্ছা করেই কাউকে হ্যা বা না বলিনি। রাস্তায় দেখা হলে আড়চোখে একটু তাকিয়ে মুচকি হেসে চলে আসতাম। অনেক ছেলে এতেই সন্তুষ্ট হয়ে বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে দিতো দামি গিফট। এতে আমি আরো উৎসাহিত হয়ে অবাধে চালিয়ে যেতে লাগলাম *ছেলেদের মাথা নিধন প্রকল্প।* সাফল্যের হার ১০০%।

কিন্তু সাফল্যের এই ধারাবাহিকতায় হঠাৎ বিপত্তি ঘটালো মিহির নামের একটি ছেলে। চট্টগ্রামে খালার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে পরিচয়। বান্ধবীদের কাছে জানলাম কাউকে নাকি সে পাত্তা দেয় না। তার অসংখ্য গুণগান মেশানো কথা শুনলাম। তাদের প্যানপ্যানানি শুনে কান দুটি প্রায় ঝালাপালা। মনে হলো যেন তারা আওয়ামী শাসন আমলের বিটিভির খবর পড়ছে। বান্ধবীদের জ্বালাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বললাম।

তার মার্জিত আচরণ ও প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করলো। আমিও থেমে থাকলাম না। আমার প্রতি আকর্ষণের জন্য আমার প্রকল্পের স্টকে রাখা সকল অস্ত্র একে একে তার ওপর ব্যবহার করতে

লাগলাম। কিন্তু হায়! কোনো অস্ত্রই তাকে ঘায়েল করতে পারলো না। বুঝলাম এই চিজ সাধারণ আফগান নয় যেন সাক্ষাৎ লাদেন। আর আমার একরোখা স্বভাবের কারণেই সিদ্ধান্ত নিলাম এই চিজকে আমার ফাদে ফেলবো। সেই মোতাবেক নারীদের সর্বশেষ অস্ত্র অর্থাৎ শারীরিক অস্ত্র দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের পরিকল্পনা করলাম। এ সিদ্ধান্তই আজ আমাকে ঠেলে দিয়েছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

পরদিন তাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলাম। রিকশায় বসে হাতে চুমু দিয়ে আমার মনের কথা জানালাম। সে কিছু বললো না। শুধু ঠোটের কোণ দিয়ে একটু হাসলো। অনেকক্ষণ ঘোরার পর সে আমাকে আড়ং-এর একটি শো-রুমে নিয়ে গেল। বেশ দাম দিয়ে একটি শাড়ি কিনে প্যাক করতে বললো। এক্ষেত্রেও তার রুচির প্রশংসা করতে হয়। কারণ শাড়িটি ছিল খুবই সুন্দর। প্যাকিং করা হলে সে আমার হাতে দিয়ে বললো, আমার ভালোবাসার প্রথম উপহার। এটা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করো।

আবেগ আপ্লুত আমি সেটা চোখ বুঝেই গ্রহণ করলাম। আমিও তাকে একটি টাই গিফট দিলাম। সে ধন্যবাদ জানিয়ে নিল।

এরপর আমাকে তার বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেল সে। বন্ধুটি বাসায় আপাতত একা। কারণ তার বাবা-মা দুজনই চাকরিজীবী। বন্ধুটি হালকা আপ্যায়ন করানোর পর বেরিয়ে গেল। আবেগে অন্ধ আমি তখনো বুঝতে পারিনি নিজের পাতা ফাদে নিজেই ফেসে যাচ্ছি।

একটু পরে মিহির আমাকে বললো, দুই একদিন পর তো চলে যাবে, শাড়িটা পরে এসো দেখি তোমাকে কেমন লাগে?

আমিও আপত্তি না জানিয়ে পাশের রুমে গিয়ে শাড়ি পরে তার সামনে এলাম। সে বিমুগ্ধ চিত্তে অপলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমিও ঢং করে জিজ্ঞাসা করলাম, এই! এভাবে কি দেখছো?

সে ধীর পদক্ষেপে আমার কাছে এসে চিবুক ধরে বললো, হে অপরূপা! এ নরাধম কি তোমার যোগ্য?

বললাম, কেন, কি হয়েছে?

মিহির বললো, আমার মনে হচ্ছে স্বর্গের কোনো হুরপরী আজ মর্ত্যে নেমে এসেছে।

বললাম, থাক আর পাম্প দিতে হবে না।

সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাত ধরে কাছে টেনে নিল। আমিও সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেলাম। সে প্রথমে আমাকে তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ঠোটে চুমু খেলো। আমিও প্রতিদানে চুমু দিলাম। এতে সে আরো উৎসাহিত হয়ে অস্থির হাতে আমার বুক দলিত-মথিত করতে লাগলো। আমিও এক অনাস্বাদিত সুখের নেশায় বিভোর। একে একে সে আমার শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রা, পেটিকোট, প্যান্টি খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন করে বিছানায় নিয়ে গেল। এরপর সে নিজের জামা-কাপড় খুলে ফেলে আমার ভেতরে আসার চেষ্টা করলো। জীবনে এই প্রথম আমার ভেতরে পুরুষের স্পর্শ পেলাম।

অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগলো আমার। না চেচিয়ে বেশ কষ্টে ঠোটে ঠোট চেপে রইলাম। মিহির শেষ পর্যন্ত উত্তেজনা চরমে উঠে যাওয়ায় কামনায় আরো অস্থির হয়ে গেল। আমার শরীর যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। আমি সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলাম সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মিহিরের আলিঙ্গন আবদ্ধ হয়ে শুয়ে আছি। আমি রক্তাক্ত জলভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে তাকে নীরবে বকলাম। এরপর সে আমাকে বাথরুমে নিয়ে নিজে গোসল করলো এবং আমাকেও করালো। তার পরদিন বিদায় নিয়ে কুমিল্লা চলে এলাম। তার দেয়া সেই শাড়িটি আজো সযত্নে রেখেছি। তারপর মিহির আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি। আমি এখন প্রকল্প চালাই না। কারণ আমার সেই অহঙ্কার তো মিহির কেড়ে নিয়েছে একটি শাড়ির বিনিময়ে।

ঢাকা থেকে